যে গল্প ঈমান জাগায়

শায়খ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি

যে গল্প ঈমান জাগায়

শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দি

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

তাকমিল : জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাকতাবাতুল ইলম

বিশুদ্ধ বইয়ের বিশ্বস্ত ঠিকানা

আমাদের কথা

মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি গোটা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, এক ও অদ্বিতীয় এবং জগৎ সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁকে উম্মাহকে পরিশুদ্ধ করার নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়েছে।

শায়খ জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি। তিনি একাধারে প্রখ্যাত আলেম, আধ্যাত্মিক পির এবং একজন বিশ্ববিখ্যাত দায়ি। ইসলামের আলো সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে তিনি সফর করেছেন বহু দেশ। তাঁর বয়ান এবং লেখনী শ্রোতা ও পাঠকের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে। বইয়ে দেয় অনুতাপের অশ্রু।

বক্ষ্যমাণ সিরিজ গ্রন্থটি তাঁরই বিভিন্ন মজমায় পেশকৃত বয়ানসমূহের নির্যাস। এই সিরিজের বইগুলো হচ্ছে, **'যে গল্প ঈমান বাড়ায়, যে গল্প ঈমান জাগায়, যে গল্প জীবন সাজায়, যে গল্প হৃদয় জাগায়, আল্লাহওয়ালাদের একগুচ্ছ গল্প ও আল্লাহওয়ালাদের হৃদয়ছোঁয়া গল্প।'**

পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে বইগুলো সম্মিলিতভাবে এক মলাটে **'তাজা ঈমানের ৫০০ গল্প'** নামেও মুদ্রিত হয়ে আসছে যা ইতিমধ্যে পাঠকমহলে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠককে একটি বিষয়ে লক্ষ্য করার অনুরোধ রইলো—বইগুলো শুধু পড়েই ক্ষ্যান্ত না হয়ে বাস্তব জীবনে কার্যকর করার প্রয়াস নেবেন।

বইগুলো সুন্দর ও নির্ভুল করার জন্য চেষ্টায় ত্রুটি করা হয়নি। এরপরও যদি কোনপ্রকার ভুলত্রুটি কারো নজরে পড়ে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক জানানোর আবেদন রইলো। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো। মহান আল্লাহ তায়ালা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।.

বিনীত
প্রকাশক

সূচিপত্র

অবিচলতা

ইচ্ছাশক্তির উপর খোদায়ি সাহায্য ৯
গরম তেলে দগ্ধ হয়ে কাবাব হতেও প্রস্তুত ৯
ফিরাউন হযরত মুশাতার অবিচলতায় ফাটল ধরাতে পারেনি........ ১১
কবর থেকে মেশকের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো ১২
পাহাড় গলে গেলো........ ১২
রাজপ্রাসাদে সাহাবির অবিচলতা........ ১৩
অবিচলতা থাকলে আগুনে জ্বলতে হতো না........ ১৪
ফতওয়া প্রদানে নির্ভীক ইমাম মালেক রহ. ১৫
১৮৫৭ সন : নমরুদের পুনরাবৃত্তি........ ১৫
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ১৬
শাহি দরবারে আলফেসানি রহ.-এর বীরত্ব ১৬
আল্লাহর তরবারির দৃঢ়তায় কুফর ছিন্নভিন্ন ১৭
সমরকন্দি যুবকের দৃঢ়তা ও অবিচলতা........ ১৮
হযরত সাইদ ইবনে যুবায়ের রাদি.-এর দৃঢ়তা ১৮
বেদনাময় ভ্রমণ-কাহিনী ১৯
ধৈর্যের কঠিন মুহূর্ত........ ২০
ফিরাউন হযরত আসিয়াকে টলাতে পারলো না........ ২১
ঘোড়ার দৃঢ়তা........ ২৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফুর ধৈর্য ২৪

ইলমের বরকত

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সতেরো হাদিছ........ ২৫
সে পেস্তার ফালুদা খাবে........ ২৬
ইলম হযরত সালেম রহ.-কে কোথায় পৌঁছে দিলো ২৭
ইজ্জত কাপড়ে নয়—ইলমের খাজানায়........ ২৭

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণ ২৮
দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন ২৮
তালিবে ইলমের দোয়ার বরকত ২৯
নববি ইলম অন্বেষণকারীদের দোয়াগ্রহণ ৩০
তালিবুল ইলমকে আপ্যায়ন করানো যেনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই আপ্যায়ন করানো ৩২
হাদিছ মুখস্থ করার বরকত ৩২
শাত্বিয়া নামক কিতাবের বরকত এতো বেশি কেনো? ৩৩
আসেফ ইবনে বারখিয়া রহ.-এর ইলম, আমল ও ইখলাসের বর্ণনা ৩৩
ফারুকে আযম রাদি.-এর ইলম ও ইখলাসের বরকত ৩৪
ইমাম গাযালি রহ.-এর প্রতি প্রশ্ন— তোমার পড়ার উদ্দেশ্য কী? ৩৫
উত্তম নিয়তে কিতাব পড়া দরকার ৩৬
একজন ডক্টরের আফসোস ৩৭
ইলমের রাস্তায় ধোঁকাবাজি কীভাবে? ৩৭
আল্লাহর উপর ভরসায় খোদায়ি সাহায্য ৩৮
দুনিয়া বিমুখতা ৪০
পাগড়ি গ্রহণে হযরত থানবি রহ.-এর অনীহা ৪১
সে দারুল উলুমের ছাত্র নয় ৪১
যে গমের বরকত আজো অব্যাহত ৪২
ইমাম শাফি রহ.-এর জ্ঞানের পূর্ণতা ৪৫

ইলমের প্রতি আকর্ষণ এবং মুতালাআর স্বাদ

দু'জন নবির প্রশ্ন ও আশ্চর্য জবাব ৪৭
ইমাম মুসলিম রহ.-এর মুতালাআর নিমগ্নতা ৪৮
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-এর ইলমি মজলিস ৪৯
ইলম-এর প্রতি আকর্ষণ তো একেই বলে ৪৯
ইলমের আকর্ষণে ঘুম উড়ে যায় ৫০
জ্ঞানার্জনের মেহনত ৫০
অন্তিম মুহূর্তেও ইলমের প্রতি আকর্ষণ ৫১
যে পথের পথিক আমরা ৫১
ইলমের তৃষ্ণায় জেলখানায় অবস্থান ৫২

ইলমের পিপাসা এমনও হয়?..৫৩
ফতওয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন..............................৫৪
এমনও জ্ঞানপিপাসু ছিলো তখন...৫৪
চিঠির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতাম না ৫৫
যে কলমের বিশ্রাম নেই ৫৬
সফরের প্রবল আগ্রহ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ৫৬
দরসের প্রতি আগ্রহের অনন্য দৃষ্টান্ত ৫৮
নেতৃত্বের ভুল জাতির ধ্বংসের কারণ ৫৯
পড়াশোনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা দরকার..৫৯

প্রতিভা ও জ্ঞানের সূক্ষ্মতা

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. মুখস্থশক্তি কোথায় পেলেন?.............................৬২
মুখস্থ তো এমনই হওয়া চাই ৬৩
হাদিছের হাফেয এমনও ছিলেন...৬৪
ফকিহগণের তীক্ষ্ণ মেধা ৬৪

অবিচলতা

ইচ্ছাশক্তির উপর খোদায়ি সাহায্য

বাইবেলে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। পবিত্র কুরআন শরিফেও এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। হযরত দাউদ ও তালুত আলাইহিস সালাম তৎকালীন বাদশাহ জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। জালুত ছিলো বিশাল দেহ ও শক্তির অধিকারী। সে এমন আকার-আকৃতির ছিলো যে, তাকে দেখলেই আতঙ্ক সৃষ্টি হতো। দাউদ ও তালুত আলাইহিস সালাম উভয়ে জালুতকে দেখলেন। তালুত আলাইহিস সালাম বললেন—

"It is very dificult to kill him becouse he is very big"

'তাকে হত্যা করা খুবই কঠিন। কারণ, সে বিশাল দেহের অধিকারী।'

কিন্তু হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন—

"It is very easy to kill him becouse he is very big, I never miss him"

'তাকে হত্যা করা খুবই সহজ। কারণ, সে বিশাল দেহের অধিকারী। আমার লক্ষ্য ভুল হয় না।'

তিনি জালুত-এর কপাল লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারলেন। ফলে সে মারা গেলো।

মানুষ যখন দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে কোনো কাজ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন।[১]

গরম তেলে দগ্ধ হয়ে কাবাব হতেও প্রস্তুত

হযরত উমর ফারুক রাদি.-এর খিলাফতকালে দু'জন মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দী হন। কাফেররা তাদের বাদশাহকে পরামর্শ দেয় যে, আমরা

---

১. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ২/১৪৪।

তাদের চেহারায় যে সাহস ও নির্ভীকতা দেখেছি, তাতে মনে হয় তাদেরকে যদি হত্যা না করে কোনোভাবে আমাদের ধর্মে আনা যায় তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে। তাদের পরামর্শে বাদশাহ বন্দী দু'জনকে বললো, 'তোমরা যদি আমাদের ধর্ম গ্রহণ না করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো।' কিন্তু তারা জবাব দিলো—

فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا.

'তুমি যা কিছু করতে চাও করো, তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনের উপরই কর্তৃত্ব করতে পারবে'[২]

বাদশাহ তাদের এ জবাব শুনে বিচলিত হয়ে পড়লো। চিন্তা করতে লাগলো, তাহলে এদেরকে কীভাবে ভয় দেখানো যায়। পরামর্শ হলো, এদের একজনকে যদি গরম তেলে দগ্ধ করা হয় তাহলে একজন আমাদের হাতছাড়া হলেও অন্তত বাকি একজন তো আমাদের করতলগত হবে। পরামর্শ অনুযায়ী তাই করা হলো। তেল গরম করা হলো। একজনকে তেলে ছেড়ে দেয়া হলো। গরম তেলে গোশত ছেড়ে দিলে যেমন গোশত কাবাব হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে ওই মুসলমানও তেলে কাবাব হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে অপরজন কাঁদতে লাগলো। কাফেররা মনে করলো, সে হয়তো ভয় পেয়েছে। আমাদের কথা মেনে নেবে। তাই বললো, 'আমরা তো আগেই বলেছি, আমাদের কথা মেনে নাও তাহলে মুক্তি পাবে। প্রথম জনের যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন কেঁদে কী হবে। যাহোক, তাহলে তুমি আমাদের কথা মেনে নিলে তো?' তখন তিনি বললেন, 'তোমরা হয়তো ভাবছো, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি? আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। বরং আমি এ ভেবে কাঁদছি যে, আমার তো একটা প্রাণ। তোমরা আমাকে তেলে ছেড়ে দিলে সে প্রাণটা বের হয়ে যাবে। কিন্তু আমার দেহে যদি আমার শরীরের পশমের সমপরিমাণ প্রাণ থাকতো, আর তোমরা আমাকে ঠিক ততবার তেলে ছাড়তে, আর প্রতিবারই আমি আমার আল্লাহর জন্য একটি একটি করে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারতাম।'[৩]

---

[২]. সুরা ত্বহা, আয়াত : ৭২।

[৩]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/১৪১।

ফিরাউন হযরত মুশাতার অবিচলতায় ফাটল ধরাতে পারেনি

ফিরাউনের দরবারে মুশাতা নামে একজন নারী ছিলেন। যিনি ফিরাউনের মেয়েকে মাথার চুল বিলি করে দিতেন। একদিন ফিরাউনের মেয়ের মাথার চুল বিলি করতে গিয়ে হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলো। তখন তিনি মুসা আলাইহিস সালাম-এর রবের নাম নিয়ে চিরুনি তুললেন। বিষয়টি ফিরাউনের মেয়ে লক্ষ্য করলো। সে বুঝতে পারলো, এ পরিচালিকা আমার বাবাকে খোদা বলে মানে না। বরং সে মুসার আল্লাহকে খোদা মেনে নিয়েছে। সে মুশাতাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি আমার বাবাকে খোদা বলে স্বীকার করো না?' মুশাতা বললেন, 'কখনো না। আমি মুসার আল্লাহকে খোদা বলে মেনে নিয়েছি।' মেয়ে তৎক্ষণাৎ গিয়ে ফিরাউনের কাছে ঘটনা খুলে বললো। ফিরাউন তো ঘটনা শুনে রেগে ফেটে পড়লো। ফিরাউন বললো, 'আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যে, হয়তো সে আমাকে খোদা বলে মেনে নেবে, অন্যথায় সে প্রাণ হারাবে।'

অবশেষে মুশাতাকে দরবারে ডেকে মুসার রবের উপর থেকে ইমান ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু তিনি বললেন, 'এটা আমি করতে পারবো না।' ফিরাউন তাকে ধমক দিলো। তিনি বললেন, 'আপনার যা করার করতে পারেন। আমি ইমান ছাড়তে পারবো না।' এরপর ফিরাউনের নির্দেশে তাকে মাটিতে শুইয়ে দেয়া হলো। তাঁর একটা ছোট বাচ্চা ছিলো। ফিরাউন চিন্তা করলো তার সামনে যদি তাঁর বাচ্চাকে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয়, তাহলে হয়তো সে মাতৃত্বের মমতায় অপারগ হয়ে আমার কথা মেনে নেবে। তখন ফিরাউন তাঁর বাচ্চাকে এনে তার বুকের উপর বসিয়ে দিলো। শিশুবাচ্চা মায়ের বুকের দুধ খেতে শুরু করলো। ফিরাউন বললো, 'এখন তোমার সামনে তোমার বাচ্চাকে হত্যা করা হবে।' মুশাতা বললো, 'এখন আমার ইমান এতোটাই সুদৃঢ় হয়েছে যে, আমি যদি আমার সন্তানকে রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে দেখি তাহলেও আমি একটুও নড়বো না। আমি আমার ইমান ছাড়তে পারবো না।' এরপর তাঁর বুকের উপরই সন্তানের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়।

চিন্তা করুন, এমন পরিস্থিতিতে একজন মায়ের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে? যাহোক, তারপর ফিরাউন বললো, 'এখন তোমাকে হত্যা করবো।'

মুশাতা বললো, 'তোমার যা খুশি করতে পারো। আমি ইমান ছাড়তে পারবো না।' এরপর তাকেও শহিদ করে দেয়া হয়।[৪]

কবর থেকে মেশকের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো

হাদিছে এসেছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গমন করেন। তখন পথিমধ্যে এক উপত্যকা থেকে মেশকের সুঘ্রাণ আসছিলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে এ সুঘ্রাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ফিরাউনের দরবারে মুশাতা নামে যে দাসী ছিলো এখানে তাঁর কবর। আর এ কবর থেকেই সুঘ্রাণ আসছে। সুবহানাল্লাহ!

পাহাড় গলে গেলো

একব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, কেউ তাকে বলছে—'তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় বের হও এবং বের হওয়ার পর তুমি প্রথম যা দেখতে পাবে তা যদি তুমি ভক্ষণ করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে উচ্চমর্যাদা দান করবেন।' লোকটি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু বের হয়ে প্রথমেই তার চোখ পড়লো একটি পাহাড়ের দিকে। তখন সে ভাবলো, এ পাহাড় তো খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই একবার ভাবলো বাড়ি ফিরে যাই। আবার ভাবলো, চেষ্টা করে দেখি, যদি কোনো ফলাফল হয়। চিন্তাভাবনা করতে করতে তিনি সামনে আগ্রসর হলেন। কিন্তু দেখা গেলো, যতই সামনে অগ্রসর হয়, ততই পাহাড় ছোট হতে লাগলো। একপর্যায়ে তিনি যখন পাহাড়ের নিকট পৌঁছলেন দেখলেন, পাহাড় আর পাহাড় নেই। বরং পাহাড় গুড়ের খণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে। তখন তিনি গুড়ের খণ্ডটি খেয়ে নিলেন।

মনের দৃঢ় ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা পাহাড়কেও তার জন্য গুড়ের খণ্ডে পরিণত করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। চেষ্টা করা বান্দার কাজ, ফলাফল দেয়ার মালিক আল্লাহ তাআলা[৫]

---

[৪]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/২০২।

[৫]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/১৮৬।

রাজপ্রাসাদে সাহাবির অবিচলতা

সাহাবায়েকেরাম রাদি. পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ওই শহরটি অবরোধ করেন যে শহরে রাজার সিংহাসন ছিলো। কয়েকদিন ব্যাপী এ অবরোধ অব্যাহত থাকে। তখন বাদশাহ মন্ত্রী-পরিষদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে। বললো— 'এরা তো যেদিকেই পা বাড়ায় সেদিকেই জয় লাভ করে। এখন আমরা কী করতে পারি? আমাদের মুক্তির উপায় কী?' মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলো— 'বাদশাহ সালামত! এরা তো অন্নহীন। দরিদ্র। সুতরাং আপনি এদেরকে প্রাসাদে ডেকে আমাদের শৌর্য-বীর্য দেখিয়ে দিন। আমাদের ধন-সম্পদ দেখে এরা ঘাবড়ে যাবে। তখন বাদশাহ সন্ধির জন্য সাহাবায়েকেরামের কাছে প্রতিনিধি পাঠালো।

সাহাবায়েকেরামের পক্ষ থেকে দূত হয়ে যিনি এলেন, তাঁর গায়ে ছিলো বাবলা কাঁটা দ্বারা সেলাই করা জামা। ঘোড়ার উপর বিছিয়ে বসার মতোও কিছু ছিলো না। তাই খালিপিঠে চড়ে তিনি প্রাসাদে আসলেন। হাতে ছিলো একটি নেযা। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা রাজ-প্রাসাদে গিয়ে শাহি আসনে বসে পড়লেন। এতে বাদশাহ খুব রেগে গেলো। সে বললো—'তোমাদের কোনো আদব-কায়দা জানা নেই? তোমার কী স্মরণ আছে, তুমি কার দরবারে এসেছো? ভদ্রতা ও সৌজন্যতা বলতে তোমাদের মাঝে কিছুই নেই।' সাহাবি রাদি. বললেন—'এটা আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা।' এতে বাদশাহ আরো রেগে গেলো। এরপর বললো—'যাহোক! এখন বলো, তোমরা কী চাও।' তখন সাহাবি রাদি. বললেন—'ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপত্তা পাবে।' বাদশাহ বললো—'এটা পারবো না।' সাহাবি রাদি. বললেন—'তাহলে তোমাদের রাজত্ব আমাদের হাতে দিয়ে দাও। তোমরা স্বাধীনভাবে এ রাজ্যে বসবাস করতে পারবে।' বাদশাহ বললো—'এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমরা আমাদের রাজত্ব তোমাদের মতো অন্নহীন-দরিদ্রদের হাতে দিয়ে দেব?' তখন সাহাবি রাদি. বললেন—'তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। তরবারিই হবে আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালাকারী। তোমাদের স্ত্রীরা হবে আমাদের দাসী।'

রণসাজে সজ্জিত প্রাসাদের সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে তিনি এসব কথা বললেন। নিজের প্রাসাদে তাও আবার সকল মন্ত্রী-পরিষদের সামনে এমন কথা শুনে বাদশাহর সারা শরীরে ঝড় বয়ে গেলো। শরীর ঘেমে গেলো। সে বললো—'তোমাদের এ জংধরা তরবারি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কী যুদ্ধ করবে?' সাহাবি রাদি. বললেন—'হে বাদশাহ! তুমি আমাদের জংধরা তরবারি দেখেছো। কিন্তু তরবারির পেছনের হাতগুলো দেখনি। তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে এ তরবারিগুলো কাদের হাতে রয়েছে।' আল্লাহু আকবার

সাহাবির কথায় আল্লাহ তাআলা প্রভাব সৃষ্টি করে দিলেন এবং তাঁদেরকে বিজয় দান করলেন।[৬]

অবিচলতা থাকলে আগুনে জ্বলতে হতো না

একবার সিররি সাকাতি রহ. দুপুরের সময় কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য তিনি একটি গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। কিছুসময় পর যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন তাঁর কানে একটি আওয়াজ ভেসে এলো। তিনি বুঝতে পারলেন আওয়াজটি এ গাছের থেকেই বের হচ্ছে। গাছ তাকে বলছে—

كُنْ مِثْلِيْ!

'হে সিররি সাকাতি! তুমি এ গাছের মতো হয়ে যাও।'

তখন তিনি বললেন—

كَيْفَ أَكُوْنُ مِثْلُكَ؟

'সেটা কীভাবে?'

গাছ বললো—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَنِيْ بِالْأَحْجَارِ فَأَرْمِيْهِمْ بِالْأَثْمَارِ-

'আমাকে দেখো, মানুষ আমার দিকে পাথর ছুড়ে মারে। তথাপি আমি তাদের দিকে ফল ছুড়ে মারি।'

---

[৬]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৩/৬৯।

আল্লাহর অলিদের অন্তর্দৃষ্টি থাকে। তাই একথা শোনার পর তাঁর মনে প্রশ্ন উঁকি দিলো। তিনি গাছকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যদি এতোই মহৎ হবে, তাহলে তোমাকে কেনো আগুনের ইন্ধন বানানো হলো?' তখন গাছ বললো, 'আমার মধ্যে একটি দুর্বলতা আছে, যে দুর্বলতা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দীয়। যার ফলে আমার এ শাস্তি। আর সে দুর্বলতা হলো, বাতাস যেদিকে দোলে, আমিও সেদিকে দুলতে থাকি। অর্থাৎ আমার মধ্যে কোনো দৃঢ়তা নেই।'

ফতওয়া প্রদানে নির্ভীক ইমাম মালেক রহ.

একবার ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে কোনো একটি বিষয়ে ফতওয়া জানতে চাওয়া হলো। কিন্তু তিনি শাসকের ইচ্ছার পরিপন্থী ফতওয়া দিলেন। ফলে তাঁকে গাধার পিঠে চড়ানো হলো। চেহারায় কালোরঙ মেখে দেয়া হলো। এরপর তাঁকে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হলো। এরপর ইমাম মালেক রহ. বললেন—'হে লোকসকল! তোমাদের মাঝে যে আমাকে চেনে সে তো চেনেই। আর যে না চেনে তাকে বলছি, আমি আনাসের পুত্র মালেক।'

দেখুন! হযরত ইমাম মালেক রহ.-এর সাহসিকতা। তিনি নিন্দুকের নিন্দার কোনো পরওয়া করেননি।[৭]

১৮৫৭ সন : নমরুদের পুনরাবৃত্তি

ভারতবর্ষ থেকে ইসলামকে চিরতরে খতম করার জন্য ইংরেজরা যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি হলো—

১. সর্বপ্রথম সমস্ত কুরআনকে ধ্বংস করতে হবে। ২. সকল ওলামায়েকেরামকে হত্যা করতে হবে। ৩. জিহাদের চেতনা মুছে ফেলতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কাজ শুরু করলো। তিন বছরের মধ্যে তিনলক্ষ কুরআনের কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেললো। চৌদ্দ হাজার ওলামায়েকেরামকে ফাঁসি দিয়ে শহিদ করলো।

টমসন তার ইতিহাস-গ্রন্থে লিখেছেন, দিল্লি থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত মহাসড়কের দু'পাশে এমন কোনো গাছ ছিলো না, যে গাছে আলেমদের

---

৭. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/১৬৯।

লাশ ঝুলতে দেখা যায়নি। শাহি মসজিদসহ সকল মসজিদে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিলো।

টমসন বলেন, 'আমি দিল্লির এক সেনাক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম। মানুষের গোশত পোড়ার গন্ধে আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। ক্যাম্পের পিছনে গিয়ে দেখলাম জ্বলন্ত আগুনের সামনে চল্লিশজন আলেমকে আনা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, 'তোমরা যদি আমাদের কথা মেনে না নাও তাহলে তোমাদেরকে এই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।' সেসকল আলেমগণ একথা উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাপ দিলো। এরপর আবার চল্লিশজন আলেমকে আনা হলো, তারাও পূর্বের মতো আগুনে ঝাপ দিলো। পুরো ক্যাম্পে তাঁদের গোশত পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিলো।[৮]

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

মাওলানা আহমাদুল্লাহ গুযরাটি রহ. ছিলেন অনেক বড়ো আলেম। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের আন্দোলন চলাকালে এক ইংরেজ তাঁর কাছে আরবি শিখতো। যেসকল ইংরেজ আলেমদের সম্মান ও কদর করতো, সে ইংরেজ ছিলো তাদের মধ্যে একজন। সে একদিন গুযরাটি রহ.-কে বললো, 'হযরত! আপনি শুধু একবার বলুন, এ আন্দোলনে আমি শরিক নই। তাহলে আপনি সকলপ্রকার জুলুম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন।' তখন মাওলানা আহমাদুল্লাহ গুযরাটি রহ. বললেন, 'আমি পছন্দ করি না যে, একথা বলার দ্বারা আল্লাহর দফতর থেকে আমার নাম কেটে দেয়া হোক।' সুবহানাল্লাহ! দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত; কিন্তু ইংরেজদের সাথে হাত মিলাতে রাজি নন।[৯]

শাহি দরবারে আলফেসানি রহ.-এর বীরত্ব

ইমামে রব্বানি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি রহ. হিন্দুস্থানের সেরহিন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যুগে বাদশাহ আকবর ধর্মকে বিকৃতি করে 'দীনে ইলাহি'-র প্রবর্তন করে। যা ছিলো বিভিন্ন রুসুম ও প্রথার সমষ্টি। এদিকে বাদশাহর ছেলে জাহাঙ্গীর আলেমদের উপর ফরমান জারি করে

---

৮. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৬/৯৩।
৯. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৬/৯৪।

যে, বাদশাহকে সম্মানসূচক সিজদা বৈধ ফতওয়া দিতে হবে। সেসময় কয়েকজন ব্যক্তি দীনের হেফাজতের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। কারণ, তাদের দায়িত্বই ছিলো দীনের হেফাজত করা।

আলফেসানি রহ. অকাট্যভাবে এ সম্মানসূচক সিজদা হারাম ফতওয়া দিলেন। এ সত্যবাণী উচ্চারণের ফলে তাঁকে গ্রেফতার করে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করা হয়। তাঁর পায়ে শেকল পড়ানো হয়। এরপরও তিনি বিচলিত হননি। কারণ, তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো সামনে মাথা নত করবেন না। একপর্যায়ে তাঁর এ দৃঢ়তার ফলাফল এই হলো যে, জাহাঙ্গীর তাঁর সামনে মাথা নত করলো এবং বললো, 'আপনি যা বলবেন, তা-ই হবে।' এভাবে বিদআত নির্মূল হয়ে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হলো। এ কারণেই তাকে বলা হয়, মুজাদ্দিদে আলফেসানি তথা যামানার সংস্কারক।[১০]

আল্লাহর তরবারির দৃঢ়তায় কুফর ছিন্নভিন্ন

সাহাবায়েকেরাম রাদি.-দের জীবনী পড়লে বিস্মিত হতে হয়। একবার পরামর্শ চলছিলো। এতোজন কাফেরের বিরুদ্ধে কতোজন সৈন্য পাঠানো যায়? কেউ বললো—'সত্তরজন।' কেউ বললো—'চল্লিশজন।' কেউ বললো—'দশজন।' খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি.-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—'আমাকে একাই পাঠিয়ে দিন।' এতে কেউ কেউ বলে উঠলেন—'খালিদ! একথা থেকে অহংকারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।' তিনি বললেন—'কিছুতেই না। আমার দৃষ্টান্ত হলো বাজপাখির মতো। আর কাফেরদের দৃষ্টান্ত হলো, শিকারির ফাঁদে পড়া চড়ুইয়ের মতো। সুতরাং চড়ুই বাজপাখির সঙ্গে কী লড়বে?' তিনি আরো বললেন—'কাফেররা হলো মৃত। আর মুমিন হলো জীবিত। সুতরাং লক্ষ লক্ষ মৃত কখনো একজন জীবিত ব্যক্তিরও ক্ষতি করতে পারে না।' বাস্তবেও তাই হলো। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিজয় দান করলেন।[১১]

---

[১০]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৩/১৮৪।
[১১]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/৯৩।

সমরকন্দি যুবকের দৃঢ়তা ও অবিচলতা

সমরকন্দের সফরে এক আলেম এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে এলো। আলেম বললেন, 'এ যুবক খুবই সৌভাগ্যবান। যে রাশিয়ার যুদ্ধের সময় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিয়ে প্রকাশ্যে নামায আদায় করতো।' আমি অবাক হয়ে যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি করে সম্ভব?' তখন যুবক তাঁর পিঠের জামা সরিয়ে আমাকে দেখালো। আমি দেখলাম, তাঁর পিঠের প্রতি ইঞ্চিতে একটি করে ক্ষত রয়েছে। সে বললো, 'আমি প্রথম আযান দেয়ার পর পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। তারা আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে। আমাকে যতো মারতে থাকে আমি ততো হাসতে থাকি। তারা আমাকে বৈদ্যুতিক শক দেয়। কয়েকজন একসাথে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমি ক্লান্ত হইনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাকে বরফের উপর শুইয়ে রেখেছে। সারারাত উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। গরম লোহা দ্বারা সেঁক দিয়েছে। আমার নখ তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমি পাগলের মতো আচরণ করেছি। পুলিশ আমাকে একবছর যাবৎ নির্যাতন করে। অবশেষে পাগল হিসেবে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়। সেখানেও আমি একবছর অতিবাহিত করি। সেখানকার ডাক্তারও লিখিতভাবে জানায়, আমি পাগল। আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে গেছে। সে তো কারো ক্ষতি করে না। সুতরাং তাকে দ্বিতীয়বার যেনো গ্রেফতার করা না হয়। এরপর আমাকে মুক্তি দেয়া হলো। আমি মুক্তি পেয়ে এক জায়গায় একটি মসজিদের মতো বানাই এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিয়ে নামায পড়তাম।'

এরপর আমি সামনে গিয়ে ওই যুবকের কপালে চুমু খেয়ে বললাম—'ওই জাতির তরবারির প্রয়োজন নেই যে জাতির যুবকদের মধ্যে এমন দৃঢ়তা ও অবিচলতা রয়েছে।' আমি তাঁর দিকে বারবার তাকিয়ে ঈর্ষা অনুভব করছিলাম।

হযরত সাইদ ইবনে যুবায়ের রাদি.-এর দৃঢ়তা

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হযরত সাইদ ইবনে যুবায়ের রাদি.। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বলছেন—'আমি তোমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেবো।' কিন্তু দৃঢ়তার মূর্তপ্রতীক হযরত সাইদ ইবনে যুবায়ের

রাদি. বলছেন— 'আমি তোমাকে জান্নাত-জাহান্নামের মালিক মনে করি না।' তাঁরা ছিলেন এমন নির্ভীক। অত্যাচারী বাদশাহর সামনে সত্য বলতে দ্বিধাবোধ করতেন না।[১২]

বেদনাময় ভ্রমণ-কাহিনী

মাওলানা জাফর আহমদ থানেশ্বরি রহ. স্বীয় কিতাব 'তারিখে কালাপানি'-তে লিখেছেন— আমাদের আলেমদের একটি কাফেলা ছিলো। ইংরেজরা এ কাফেলাকে দিল্লি থেকে লাহোর পাঠায়। তারা শুধু তাদের হাতকড়া পড়িয়ে দিয়েছিলো, যার ফলে তারা সহজেই লাহোর পৌঁছেন। কিন্তু লাহোরের জেলখানার ইনচার্জ ছিলো বড়ো কঠিন লোক। সে বললো, 'এ মৌলবিরা এতো সহজে দিল্লি থেকে এখানে চলে এলো! আমি এদের আরাম বের করছি।' তারপর সে রেলগাড়ির কেবিনের চারপাশে এক দু' ইঞ্চি পর পর পেরেকলাগিয়ে দেয়। রেলগাড়ি চলার সময় ঝাকুনি হলে ওই পেরেকগুলো আমাদের শরীরে বিদ্ধ হতো। যখন গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় বার বার ব্রেক করতো তখন ওই পেরেক গুলো বার বার শরীরের একই জায়গায় বিদ্ধ হতো। ফলে শরীর থেকে ঘামের সাথে রক্ত ঝরতে লাগলো। আমাদেরকে লাহোর থেকে মুলতান পাঠানো হচ্ছিলো। আমরা এ পুরো সফরে রাত-দিন বসেই কাটাতাম। আমাদের প্রস্রাব-পায়খানা সেখানেই হতো। আমাদের জন্য পানির কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। ফলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিলো।

আমাদের উপর এ শাস্তির কারণ ছিলো যে, আমরা যেনো তাদের কথা মেনে নিই। কিন্তু আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, জুলুম সয়েছি। কিন্তু তারপরও তাদের কথা মেনে নিতে পারিনি। দীর্ঘ একমাস সফর করে যখন আমরা মুলতান পৌঁছলাম, তখন সেখানকার হাকিম বললো, 'এদের আগামীকালই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হোক।' আমাদের ফাঁসির কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলাম। চেহারায় সজীবতা ফিরে এলো। কারণ, সকল কষ্ট-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। আমাদেরকে যখন ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া

---

[১২]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৩/৬৯।

হলো, তখন আমাদের চেহারা উজ্জ্বল দেখে একজন বললো, 'তোমাদেরকে আজ এতো খুশি মনে হচ্ছে কেনো?' আমাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'আজ আমাদের ফাঁসি দেয়া হবে, আর ফাঁসি দেয়া হলে আমরা শাহাদাতবরণ করতে পারবো। তাই আমরা আজ এতো খুশি।'

সে ভিতরে গিয়ে তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালো। সে বললো, 'এরা সবাই ফাঁসি দেয়া হবে শুনে অনেক খুশি।' এরপর সে ফিরে এসে বললো, 'তোমরা ফাঁসির কথা শুনে খুশি হচ্ছো। কিন্তু আমরা তোমাদের ফাঁসি দেবো না, বরং আগামীকাল তোমাদের কালাপানি পাঠিয়ে দেবো।'

কালাপানি পৌঁছে হযরত জাফর আহমদ থানেশ্বরি রহ. একটি কবিতা লিখলেন—

مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا

(کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

'যে বাড়ি ফিরতে চায়, তাকে বন্দী করা হয়েছে

কী-ই বা আর বলার আছে, মুক্তি পেতে-পেতে আর মুক্তি হলো না।'

ধৈর্যের কঠিন মুহূর্ত

তিনি বলেন, 'তারা আমাদেরকে কালাপানি পাঠিয়ে দেয়ার পর আমরা আরো বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। সেখানে তারা আমাদের হাতে-পায়ে বেড়ি পড়িয়ে আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে আমাদের সামনে ডেকে এনে তাদের বললো, 'তোমরা এদের সবাইকে বলে দাও, যদি এরা আমাদের কথা মেনে নেয়, তাহলে এদের সবাইকে তোমাদের সাথে পাঠিয়ে দেবো।' এখন আমাদের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র সবাই কাঁদতে লাগলো। আমার এক শিশুপুত্র আমার বুকে লেগে বলতে লাগলো, 'আব্বু! তুমি একথা কেনো তাদের বলে দাও না, তুমি আমাদের সাথে আমাদের ঘরে ফিরে যাবে।' তিনি বলেন, 'এ পরীক্ষার চেয়ে আর কোনো বড়ো পরীক্ষা আমার জন্য ছিলো না।' আমি আমার স্ত্রীকে ইশারা করে বলে দিলাম যে, তুমি আমার এ ছেলেকে বলে দাও যে, 'তোমার বাবার হায়াত থাকলে অবশ্যই সে

আমাদের কাছে ফিরে আসবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারের প্রাঙ্গণে আবার দেখা হবে।'

আমি সালাম জানাই ওই সকল আলেমদের প্রতি, আমি শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের অবিচলতার প্রতি, যারা অসহনীয় কুরবানির মাধ্যমে দীনের হেফাজত করতে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা কত কষ্ট সহ্য করে দীনকে আমাদের কাছে অক্ষতভাবে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।[১৩]

ফিরাউন হযরত আসিয়াকে টলাতে পারলো না

ফিরাউন হযরত মুশাতাকে শহিদ করে ঘরে ফিরে হযরত আসিয়াকে বলতে লাগলো—'আজ এ মহিলাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছি।' হযরত আসিয়া বললেন—'তুমি ধ্বংস হও। তুমি একটি নিষ্পাপ সন্তানসহ মাকে হত্যা করেছো।' ফিরাউন বললো—'সে আমাকে খোদা বলে স্বীকার না করার কারণে আমি তাকে হত্যা করেছি।' একথা শুনে হযরত আসিয়া বললেন—'তোমাকে খোদা বলে আমিও স্বীকার করি না। কারণ, তুমি একজন সাধারণ মানুষ।' ফিরাউন নিজের স্ত্রীর মুখে একথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো। কারণ, সে আসিয়াকে খুবই ভালোবাসতো। আসিয়াকে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ রূপ-লাবণ্য দান করেছিলেন। শত শত সুন্দরী নারীদের মাঝ থেকে তাকে বেছে নেয়া হয়েছিলো। ফিরাউন বললো—'তুমি এ কী বলছো?' আসিয়া বললেন—'আমি ঠিকই বলছি। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যার বার্তা নিয়ে এসেছেন তিনিই আল্লাহ।' এতে ফিরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে বললো—'দেখো আসিয়া! তোমার পরিণামও কিন্তু আমি মুশাতার মতো করবো।' আসিয়া বললেন—'তোমার যা করার করতে পারো। আমি তোমার সবকিছু ছাড়তে পারি। কিন্তু আমার আল্লাহকে ছাড়তে পারবো না।'

ফিরাউন দরবারের সকল লোকদের ডেকে বললো—'দেখো! মুসা কতো বড়ো ষড়যন্ত্র করেছে? সে তো আমার স্ত্রীকেও বশ করে নিয়েছে। আজ সে হয়তো ফিরে আসবে না হয় আমি তাকে হত্যা করবো।' ফিরাউন হযরত

---

[১৩]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/১৭৪।

আসিয়াকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করলো। কিছুক্ষণ আগেও যে ছিলো রাণী। যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। যার নির্দেশে চাকর-বাকররা দৌড়ে দৌড়ে কাজ করতো। চোখ তুলে কেউ তাকাতো না। সে এখন আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। ফিরাউন বললো—'তুমি এ মহলের রাণী। এতো নাজ-নেয়ামত তোমার পায়ের কাছে। আমি তোমাকে ভালোবেসে রাণী বানিয়েছি। কিন্তু আজ এ সবকিছু থেকে তোমাকে বঞ্চিত করা হবে। তোমার কল্যাণ চাও তো এখনো সময় আছে, আমাকে খোদা বলে স্বীকার করে নাও।'

আসিয়া বললেন—'আমি ইমান এনেছি। এ থেকে পিছু হটবো না।' ফিরাউন তখন তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলো। সর্বপ্রথম তাকে অপমান করার সিদ্ধান্ত নিলো। সে নির্দেশ দিলো সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ করা হোক।

এখন চিন্তা করুন, কোনো পুরুষকে যদি বলা হয় তোমাকে বিবস্ত্র করা হবে তাহলে তার মনে হয়, এরচে' আমার মরণ ভালো। আমি যেনো হারিয়ে যাই। আর আসিয়া তো ছিলেন নারী। স্বভাবতই নারীরা বেশি লজ্জাশীল। তাহলে তার অবস্থা কীরূপ হতে পারে?

অবশেষে তাকে বিবস্ত্র করা হলো। চিন্তা করুন, কেমন অপমানের শিকার তিনি। একদিকে ইমান অপরদিকে লজ্জা-শরমের পরীক্ষার সম্মুখীন। ফিরাউন তাকে বললো—'এখনো সময় আছে তুমি ফিরে এসো। অন্যথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে মহাশাস্তি।' কিন্তু আসিয়া পাহাড়ের মতো অটল। ফিরাউন নির্দেশ দিলো—'তাকে এ মহলের দিকে মুখ করে শোয়াও।' নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে শোয়ানো হলো। তারপর তাঁর হাতে-পায়ে পেরেক মারা হলো। যাতে সে নড়াচড়া করতে না পারে। তারপর নির্দেশ দেয়া হলো—'তার শরীর থেকে চামড়া তুলে নাও।' চামড়া তোলা শুরু করা হলো।

এবার চিন্তা করুন, জীবন্ত একজন নারীর শরীর থেকে চামড়া তোলা হচ্ছে। আর তিনি তা সহ্য করে যাচ্ছেন। আল্লাহর নাম নেয়ার অপরাধে তাঁকে এ শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে চামড়া তুলে ফেলা হলো। কিন্তু আল্লাহর কী হিকমত! তিনি এরপরও জীবিত। বেঁচে আছেন।

ফিরাউনের পাষণ্ড হৃদয় তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। সে মরিচ আনার জন্য আদেশ দিলো। সমস্ত শরীরে মরিচ লাগিয়ে দেয়া হলো। তিনি কাটা মাছের মতো লাফাতে লাগলেন। কিন্তু এমন অবস্থাতেও তিনি দোয়া করছেন—

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

'হে আল্লাহ! ফিরাউন আমাকে তার প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছে। আজকের পর থেকে আমি আর এ প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারবো না। হে আল্লাহ! এ প্রাসাদের পরিবর্তে আমি জান্নাতে একটি প্রাসাদ চাই। আর আমাকে ফিরাউন ও তার শাস্তি থেকে মুক্তি দান করো।'

আল্লাহ তাআলা তাকে সে অবস্থাতেই শাহাদাত দান করলেন।[১৪]

ঘোড়ার দৃঢ়তা

একজন মুজাহিদ যখন একটি ঘোড়া প্রতিপালন করেন এই উদ্দেশ্যে যে, এর পিঠে চড়ে আমি যুদ্ধ করবো। তখন ঘোড়াও বুঝতে পারে যে, আমাকে আদর-যত্নে প্রতিপালন করা হচ্ছে আমার দ্বারা জিহাদ করার জন্য। এরপর যখন মালিক যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে তার উপর আরোহণ করে এবং ঘোড়াকে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করায়, তখন ঘোড়া বুঝতে পারে যে, আমার মালিকের উদ্দেশ্য পূরণের সময় হয়ে এসেছে। সুতরাং ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন সে শত্রুর তীর-বর্শা, তরবারি সবকিছুকে উপেক্ষা করে শত্রুর মাঝে ঢুকে যায়। মালিক সামনে অগ্রসর হতে বললে জীবন বাজি রেখে সামনে অগ্রসর হয়। মালিকের চোখের ইশারায় নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে ঘোড়ার দৃঢ়তা ও অবিচলতার শপথ করেছেন—

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣

'প্রভাতে আক্রমণকারী ঘোড়ার শপথ।' সুবহানাল্লাহ![১৫]

---

[১৪]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/২০৩।
[১৫]. খুতাবাতে যুলফিকার, পৃ. ৮/২০০।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফুর ধৈর্য

উহুদযুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন চাচা হামযা রাদি.-এর লাশ দেখতে পেলেন— তাঁর লাশ বিকৃত করা হয়েছে, তাঁর কলিজা বের করে ফেলা হয়েছে, চক্ষু উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং কান কেটে ফেলা হয়েছে, আর হিন্দা তার কর্তিত অঙ্গ দিয়ে মালা বানিয়ে পরিধান করেছে; চিন্তা করে দেখুন, সেই লাশের অবস্থা কি বীভৎস! তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই মর্মাহত হলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। তিনি সাহাবায়েকেরামকে বললেন, 'আমার ফুফু যেনো আপন ভাইয়ের লাশ দেখতে না পারে।'

রাসুলের ফুফু অন্যান্য নারীদের সাথে হামযার লাশ দেখতে এলেন। সাহাবায়েকেরাম রাদি. তাকে জানালেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে তাঁর লাশ দেখতে নিষেধ করেছেন। তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেনো আমাকে আমার ভাইয়ের লাশ দেখতে নিষেধ করেছেন?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তার লাশ দেখে হয়তো আপনি সহ্য করতে পারবেন না, তাই নিষেধ করেছি।' তখন তিনি বললেন, 'আমি তো আমার ভাইয়ের লাশ দেখে কাঁদতে আসিনি; আমি এসেছি আমার ভাইকে শাহাদাতবরণের মুবারকবাদ জানাতে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এরূপ সাহসী কথা শুনে লাশ দেখার অনুমতি দিলেন।'

ইলমের বরকত

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সতেরো হাদিছ

বিদেশে একবার একলোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে আমাকে বললো—'ইমাম আবু হানিফা রহ.[১৬] মাত্র সতেরোটি হাদিছ জানতেন। তারপরও আপনারা নিজেদেরকে হানাফি বলেন?' আমি বললাম—'আপনার কথা শুনে তো আমি ১০০% থেকে ১০১% হানাফি হয়ে গেলাম।' সে বললো— 'মানে।' আমি বললাম—'এটা তো সত্য যে হযরত আবু হানিফা রহ.-এর নেতৃত্বে ছয় লক্ষাধিক মাসআলা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং যে মনীষী মাত্র সতেরোটি হাদিছ থেকে ছয়লক্ষ মাসআলা বের করতে পারেন। তাঁর অনুসরণ না করে, তাকে ইমাম না মেনে উপায় আছে? তাঁকে কী করে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়? তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারাটা আমি সৌভাগ্যের কারণ মনে করি। এসব কথা শুনে লোকটি নিজেকে শুধরে নিলেন। বললেন—'আসলে হযরত আবু হানিফা রহ.-কে আল্লাহ তাআলা এমন উচ্চ মাকাম দান করেছেন যে, তা বোঝাও কঠিন।

তাফসির সম্পর্কে একথা ভালো করে জেনে নিন, পবিত্র কুরআন শরিফের ওই অর্থই গ্রহণযোগ্য যা ওলামায়েকেরাম করেছেন। তাঁদের সাহচর্যে থেকেই অর্থ উদ্ধার করতে হবে। শুধু কিতাব পড়লে হবে না। সকলের জ্ঞান-বুদ্ধি এক নয়। আমাদের আকাবিরগণ যা বুঝতে পারতেন আমরা তা বুঝতে পারি না। এজন্য তাঁদেরকে মেনেই আমাদের চলতে হবে। যেমনটি হাদিছে এসেছে— 'আকাবিরদের সাথেই তোমাদের বরকত।'[১৭]

---

১৬. তাঁর নাম—নুমান ইবনে সাবিত। আবু হানিফা তাঁর লকব। তিনি ৮০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৫০ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর দিন হযরত ইমাম শাফি রহ. জন্মগ্রহণ করেন।

১৭. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৪/১৭।

সে পেস্তার ফালুদা খাবে

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.[১৮] শৈশবেই ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা রহ.-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে তাঁর মা ধোপার কাজ শেখার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত আবু হানিফা রহ.-এর দরসে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমনকি একসময় তিনি অনেক বড়ো ফকিহ হয়ে যান।

বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর মা তাঁকে বললেন— 'আমি তোমাকে ধোপার কাজ শিখতে পাঠিয়েছিলাম। কারণ, তোমার বাবা বেঁচে নেই। তুমি কোনো কাজ করলে আমরা খেতে পারবো।' মায়ের এমন কথা তিনি উস্তাদের কাছে বললেন। হযরত আবু হানিফা রহ. বললেন— 'মাকে গিয়ে বলবে, আমি এমন কিছু অর্জন করছি যার দ্বারা উপার্জন অনেক বেশি হবে।' মাকে তিনি এ কথাগুলো বললেন, কিন্তু মা বিশ্বাস করলেন না। তিনি উস্তাদের কাছে ছুটে এলেন। বললেন—'আমি তাকে পাঠিয়েছি ধোপার কাজ শেখার জন্য, কিন্তু সে দেখি আপনার এখানে এসে কিতাব পড়ছে।' তখন হযরত আবু হানিফা রহ. বললেন—'সে আমার কাছ থেকে এমন ইলম শিক্ষা করছে যে, সে একসময় পেস্তার তৈরি ফালুদা খাবে।' মা মনে করলো, হয়তো ইয়াতিম ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এমনটি বলছেন।

যাহোক! মা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। একসময় হযরত আবু ইউসুফ রহ. প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। তিনি বলেন, একবার আমি খলিফা হারুনুর রশিদের পাশে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন— 'হযরত! আমি আপনার জন্য একপ্রকার খাবার তৈরি করেছি। যা সাধারণত মাঝে মাঝে আমার জন্য তৈরি করা হয়। কিন্তু আপনার ইলমের শান অনেক উপরে। তাই এ খাবার প্রতিদিন আপনি

---

১৮. তাঁর নাম ইয়াকুব। প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে ৯৩ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ বছর হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খুব গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীসময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে অঢেল সম্পদের মালিক বানান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সম্পদ থেকে একলক্ষ দিরহাম মক্কাবাসীদের, একলক্ষ দিরহাম মদিনাবাসীদের, একলক্ষ দিরহাম কুফাবাসীদের দেয়ার জন্য অসিয়ত করে যান। তিনি ৮৯ বছর বয়সে ১৮২ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন।—سیر تابعین ۹۷/۸

পাবেন।' আমি জানতে চাইলাম, কী সে খাবার। তিনি বললেন— 'পেস্তার তৈরি ফালুদা।' তখন হযরত আবু হানিফা রহ.-এর সেকথা আমার মনে পড়ে গেলো।

দেখুন! আল্লাহ তাআলা এভাবেই বান্দার রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন।

ইলম হযরত সালেম রহ.-কে কোথায় পৌঁছে দিলো

হযরত সালেম রহ. ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। প্রথমে তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তিনশ' দিরহামের বিনিময়ে তিনি বিক্রি হয়েছিলেন। এরপর ইলম অর্জন করে এমন মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন যে, বাদশাহ পর্যন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে অনুমতি নিয়ে আসতেন।

একবার তাঁর সাথে দেখা করতে বাদশাহ আসলেন। কিন্তু তিনি তখন ইলমিকাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বাদশাহকে ফিরিয়ে দিলেন। বাদশাহ দেখা না করেই চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি দুনিয়াতে তিনশ' দিরহামে বিক্রি হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর জন্য সওদা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর দাম বৃদ্ধি করে দিলেন।

যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে এমন মর্যাদা লাভ করেছে সে সৌভাগ্যবান। আর যে এমন মর্যাদা লাভ করেনি তবে এখনো ইলম তলব করছে সেও সৌভাগ্যবান। সুবহানাল্লাহ।

ইজ্জত কাপড়ে নয়—ইলমের খাজানায়

একবার ইমাম শাফি রহ. চুল কাটাতে নাপিতের দোকানে গেলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো পুরাতন ও ময়লা কাপড়। এমন সময় একজন ধনী ব্যক্তিও আসলেন। তার গায়ে ছিলো মূল্যবান পোশাক। নাপিত ভাবলো ধনী লোকটি হয়তো বেশি পয়সা দেবে। তাই সে ইমাম শাফি রহ.-এর চুল কাটতে অস্বীকৃতি জানায়। বললো—'আমি প্রথমে ওনার চুল কাটবো। তারপর আপনার।' তখন ইমাম শাফি রহ. খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'থলিতে কী পয়সা আছে?' খাদেম বললেন, 'জী, আছে।' তিনশ' দিরহাম আছে।' ইমাম শাফি রহ. বললেন, 'এ তিনশ' দিরহামই নাপিতকে দিয়ে দাও।' নাপিত চুল না কেটে তিনশ' দিরহাম পেয়ে বিস্মিত হলো। সে

বললো, 'আপনার গায়ে রয়েছে ছেঁড়া জামা। কিন্তু এরমধ্যে যে এতো সম্পদ রয়েছে তা তো বুঝতে পারিনি।' এরপর ইমাম শাফি রহ. বাইরে এসে একটি কবিতা পাঠ করলেন—

على ثياب لو جميعها

بفلس لكان الفلس منهن اكثرا

'আমার শরীরে যে পোশাক রয়েছে তা যদি এক দিরহামের বিনিময়েও
বিক্রি করি তাহলে পোশাকের চেয়ে দিরহামের মূল্য বেশি হবে।'

কিন্তু সেই কাপড়ের ভেতরে এমন একটি প্রাণ রয়েছে, যা সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণ

ইমাম আওযায়ি রহ. ছিলেন সিরিয়ার বাসিন্দা। তিনি ইমাম আযম রহ.-এর কিছু সমালোচনা শুনতে পেয়েছিলেন। একবার ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ইমাম আওযায়ি রহ.-এর দরবারে গেলেন। তখন ইমাম আওযায়ি রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে খুরাসানি![১৯] আবু হানিফা নামের লোকটি কে? শুনেছি সে নাকি মারাত্মক পথভ্রষ্ট?'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন— একথা শুনে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। অবশেষে আমি ইমাম আযম-এর লেখা একটি মাসআলার কিতাব হযরত ইমাম আওযায়িকে দিলাম। তিনি তা পাঠ করে বললেন, 'হে খুরাসানি! এ নুমান নামের লোকটি কে? তাঁর ইলমি যোগ্যতা অনেক উপরে। তাঁর থেকে ইলমি-ফায়দা হাসিল করো।' তখন আমি বললাম, এ নুমানই সেই আবু হানিফা রহ. যাঁর সম্পর্কে আপনি আপত্তিকর কথা শুনেছেন। বাস্তবে তিনি অনেক উঁচুস্তরের। এ কথা শুনে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেলো। তিনি বললেন, 'হে খুরাসানি! তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করো এবং তাঁর থেকে ইলমি-ফায়দা হাসিল করো।'[২০]

---

১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের নিসবত। কারণ, খুরাসান ছিলো তাঁর এলাকার নাম।
২০. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৪/২৫।

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলি! ইলম অর্জনের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে কেউ বেশি গুরুত্বারোপ করেননি। আমি একবার Effective Manager-এর উপর একটি কোর্স করেছিলাম। সেই কোর্সের শিক্ষক ছিলেন Mr. Borrodi। যিনি সেসময়ে ক্যালিফোর্নিয়া, ইংল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ডের ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এমন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের লেকচারার ছিলেন। একদিন তিনি লেকচার দিতে গিয়ে বললেন—'এখন আমাদের শিক্ষাবিজ্ঞানিগণ বুঝতে পেরেছেন যে, শুধু ছাত্র বয়সেই লেখাপড়া করলে হবে না। বরং কর্মজীবনেও লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে হবে।' তিনি এ কথাটি খুব গুরুত্বের সাথে বললেন। এরপর আমি দাঁড়িয়ে বললাম—'আমি কী এ বিষয়ে আপনাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিছ শোনাবো?' তিনি বললেন—'অবশ্যই।' তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদিছটি তাকে শোনালাম।—'তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অর্জন করো।' হাদিছটি শুনে তিনি লেকচার বন্ধ করে দিলেন। তিনি ডায়েরি বের করে বললেন—'আমাকে এ হাদিছটি লিখে দাও। আমি লেকচারের মাঝে এ হাদিছটি অন্যদের শোনাবো যে, চৌদ্দ শ' বছর আগে যেকথা মুসলমানদের নবি বলে গেছেন সে বিষয়টি বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞানিগণ অনুভব করছেন।'[২১]

তালিবে ইলমের দোয়ার বরকত

সুলতান মাহমুদ গজনবি রহ. ছিলেন একজন প্রতাপশালী বাদশাহ। তিনটি বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিলো।

এক. আমি তো সুবক্তগিনের ছেলে। সুবক্তগিন প্রথমে ছিলেন একজন সাধারণ সিপাহি। তারপর বাদশাহ হয়েছেন। পিতার দিক থেকে আমার সম্পর্ক সঠিক নাকি অন্যকিছু। এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিলো।

---

[২১]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ১/৪১।

দুই. পৃথিবীতে বিভিন্ন মতাদর্শের লোক রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক কারা?

তিন. অনেকদিন যাবৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত আমার নসিব হয়নি। আমার যেনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসিব হয়।

এমতাবস্থায় তিনি একদিন বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন এক তালিবুল ইলম বাতির নিচে পড়াশোনা করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি মসজিদে গিয়ে পড় না কেনো?' ছাত্রটি উত্তর দিলো, 'মসজিদে আলোর ব্যবস্থা নেই। এখানে আল্লাহর একবান্দার ঘরের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে আমি পড়ছি।' তখন সুলতান মাহমুদ গযনবি রহ. বললেন—'ঠিক আছে যাও। কাল থেকে তুমি আলো পাবে।' এরপর তিনি আলোর ব্যবস্থা করলেন। ছাত্রটি আলো দেখতে পেয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাঁর মনের আশা পূর্ণ করে দাও।' এরপর গজনবি রহ. স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে সুবক্তগিনের পুত্র! তুমি আমার ওয়ারিসকে সম্মান করেছো। আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাকে সম্মান দান করুন।'

সুবহানাল্লাহ! একজন তালিবুল ইলম-এর দোয়ার বরকতে সুলতান মাহমুদ গজনবি রহ.-এর মনস্কাম পূর্ণ হলো। এমনকি তাঁর পিতৃ পরিচয়ের ব্যাপারে মনে যে সন্দেহ ছিলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও দূর করে দিলেন। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সুবক্তগিনের বেটা বলে সম্বোধন করেছেন। তৃতীয়তঃ তিনি একথাও বুঝতে পাললেন যে, দুনিয়াতে ওলামায়েকেরাম সর্বোত্তম মানুষ। যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ারিস।

নববি ইলম অন্বেষণকারীদের দোয়াগ্রহণ

আল্লাহর কাছে ইলম অন্বেষণকারীর মর্যাদা অনেক বেশি। হযরত বাকিবিল্লাহ রহ. ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি রহ.-এর পির ও মুরশিদ। তাঁর একটি কথা মনে পড়লো। যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

একবার খাজা বাকিবিল্লাহ রহ.-এর সামনে কোনো মুরিদ বললো, আমাদের শায়েখকে আল্লাহ তাআলা অনেক বড়ো বড়ো মুরিদ দান করেছেন। অনেক উচুঁ মর্যাদা দান করেছেন।

শায়েখ তখন চুপ ছিলেন। তাঁর এই চুপ থাকার দরুন আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা শুরু হলো।[২২] কেননা প্রবাদ আছে—

حسنات الابرار سئات المقربين-

'সাধারণ নেককারদের নেককাজ নৈকট্যশীলদের অপরাধ'

বড়োদের সঙ্গে যখন সম্পর্ক গভীর হয়, তখন আল্লাহর নিয়ামত বেড়ে যায়। এটাও মনের তৃপ্তির অন্তর্ভূক্ত যে, কেউ আপনার প্রশংসা করবে আর আপনি চুপ থাকবেন। কিছু বলবেন না।

সুতরাং পরীক্ষাস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর বিপদ আসতে শুরু করলো। অন্তরের সকল ক্ষমতা উঠিয়ে নেয়া হলো। সকল নিয়ামত তাঁর থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। ফলে তিনি কয়েকদিন যাবৎ অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন—'হে আল্লাহ! আমার যে ভুলের কারণে আমার উপর এ পরীক্ষা এলো সে ভুল সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। যাতে আমি নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারি।' অবশেষে তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে অবহিত করা হলো যে, তোমার অমুক ভুলের কারণে তোমার আজ এ অবস্থা। আর এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হলো, তুমি অমুক মাদরাসায় যাও। সেখানে ছোট ছোট ছাত্ররা রয়েছে। তাদেরকে দিয়ে দোয়া করালে দোয়া কবুল করা হবে। তোমার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেয়া হবে।

তিনি সকালে উঠে মাদরাসায় গেলেন। তাঁকে দেখে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক তাঁর সম্মানার্থে সকলেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, আপনারা আমাকে আল্লাহর অলি ভেবে দাঁড়িয়ে গেলেন। অথচ অবস্থা হলো—আমার ভুলের জন্য স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়েছে যে, এখানকার ছাত্রদের দিয়ে দোয়া করালে দোয়া কবুল করা হবে। তাই আমি

---

২২. অর্থাৎ তাঁর সামনে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। অথচ তিনি বাধা দিলেন না। তিনি এক ধরণের আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছেন। যেটা আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়নি।—অনুবাদক।

আপনাদের নিকট এসেছি। আল্লাহর কাছে আপনাদের মর্যাদা অনেক বেশি। ছোট ছোট ছাত্রদের দ্বারা দোয়া করানোর পর আল্লাহ দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।

তালিবুল ইলমকে আপ্যায়ন করানো যেনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই আপ্যায়ন করানো

হযরত তাওয়াক্কুল শাহ আম্বালুবি রহ.-এর দরস্তরখান ছিলো অনেক লম্বা। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সৃষ্টিকে খানা খাওয়াতেন। সাধারণ লোকদের খানা খাওয়ার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতি ছিলো। যে আসবে সেই খানা খেতে পারবে। তাই ফকির-মিসকিন, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলেই খানা খেয়ে যেতেন। একদিন তিনি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'হে তাওয়াক্কুল শাহ! তুমি তো প্রতিদিনই আল্লাহর দাওয়াত কর। কিন্তু আমার দাওয়াতের ব্যবস্থা তো একদিনও করলে না।'

ঘুম থেকে উঠে তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে অস্থির হয়ে যান। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন—'হে আল্লাহ! তুমি আমার কাছে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা পরিষ্কার করে দাও।' তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অন্তরে ইলহাম হলো যে, তুমি আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিদিনই খানা খাওয়াও। কিন্তু রাসুলের ওয়ারিস তথা তালিবুল ইলম, আলেম, কুরআন তিলাওয়াতকারীদেরকে গুরুত্বের সাথে কখনো দাওয়াত করোনি।' এরপর তিনি শহরের সকল আলেম-ওলামা, তালিবুল ইলম ও কুরআন তিলাওয়াতকারীদেরকে দাওয়াত করলেন।

হাদিছ মুখস্থ করার বরকত

আমার এক প্রিয়বন্ধু আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে হাদিছের হাফেয ছিলেন। একবার আমি তাকে বললাম, 'আপনি তো বুখারি শরিফের হাফেয! আপনি কি এ মুবারক হাদিছসমূহের কোনো বরকত প্রত্যক্ষ করেছেন?'

তিনি বললেন, 'হযরত! এ মুবারক হাদিছ মুখস্থ করার পর আমার উপর আল্লাহর এমন অনুগ্রহ হয়েছে যে, আমি প্রতিরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করছি। কখনো একবার, কখনো একাধিকবার। আল্লাহর শুকরিয়া। এখনো তিনি জীবিত আছেন। হাদিছের মহব্বত তাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এতো নিকটবর্তী করেছে যে, প্রতিসপ্তাহে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত লাভ করেন।'

শাত্বিয়া নামক কিতাবের বরকত এতো বেশি কেনো?

আল্লামা শাত্বিয়া রহ.[২৩] যখন শাত্বিয়া নামক কিতাব লেখেন তখন তিনি হারাম শরিফে গিয়ে বারোহাজার বার তাওয়াফ করেন। এবং দোয়া করেন—'হে আল্লাহ! তুমি এ কিতাবকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে দাও।' ফলে আল্লাহ তাআলা এ কিতাবকে এমনভাবে গ্রহণযোগ্য করেছেন যে, কেউ এ কিতাব না পড়ে কারি হতে পারে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গরা লেখার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে তার কবুলিয়াতের ব্যাপারে দোয়াও করতেন। কেননা কবুল হওয়া বা না হওয়া তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আর সেটা নির্ভর করে মানুষের তাকওয়ার উপর।

আসেফ ইবনে বারখিয়া রহ.-এর ইলম, আমল ও ইখলাসের বর্ণনা

পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা এমনকাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব যা জিনদের থেকেও সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন শরিফ পড়ে দেখুন, রাণী বিলকিসের সিংহাসন চোখের সামনে হাজির করার ব্যাপারে যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর সভাসদবর্গদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'হে আমার উপদেষ্টামণ্ডলি! তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কী যে, রাণী বিলকিস আমার কাছে আসার পূর্বেই তাঁর সিংহাসন আমার কাছে হাজির করতে পারবে?'

জিনদের মধ্য থেকে ইফরিত[২৪] নামক জিন বললো—

اِنَا اٰتِیكَ بِهٖ قَبلَ اَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ۔

---

[২৩]. আল্লামা শাতবিয়া রহ. আন্দালিস শহরে ৫৩৮ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। ২৮ জুমাদাল উলা ৫৯০ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। কাহেরায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।—যিফরুল মুহসিন, পৃ. ৬৮।

[২৪]. ইফরিত বলা হয় বড়ো জিনদেরকে।

'আপনি আপনার আসন থেকে ওঠার আগেই আমি তাঁর সিংহাসন আপনার সামনে হাজির করতে পারবো।'

তখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন—'এতো অনেক সময়ের ব্যাপার। আমি এ ব্যাপারে এরচে' অধিক দ্রুততা কামনা করছি।' জিন ব্যর্থ হয়ে গেলো। তারপর সেখানে উপস্থিত আসেফ ইবনে বারখিয়া নামক এক ব্যক্তি বললো—

انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔

'আপনি আপনার চোখের পলক ফেরানোর পূর্বেই আমি তাঁর সিংহাসন আপনার সামনে হাজির করতে পারবো।'

কে এ ব্যক্তি? পবিত্র কুরআন শরিফে তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে—

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔

'তিনি ছিলেন কিতাবের ইলমধারী ব্যক্তি।'

সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যেখানে ইফরাত নামক বড়ো জিন ব্যর্থ হয়ে গেলো, সেখানে আহলে ইলম তথা কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী একব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন। আসেফ ইবনে বারখিয়া চোখের পলক ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনটি তাঁর চোখের সামনে দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন—

قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ۔

'এটা কেবল আমার আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ।'

যখন ইলম, আমল ও ইখলাস এ তিনটি বিষয় একত্রিত হয় তখন এমন শক্তি অর্জিত হয়ে যায়। আর এ ইমানিশক্তি মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেয়।

ফারুকে আযম রাদি.-এর ইলম ও ইখলাসের বরকত

সায়্যিদুনা হযরত উমর ফারুক রাদি.-এর ইলম, আমল ও ইখলাস একত্রিত হওয়ার দ্বারা এমনশক্তি অর্জিত হয়েছিলো যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সে শক্তির দ্বারা তাঁকে রাজমুকুট পরিধান করিয়েছিলেন। তিনি খুব সাদাসিধা

জীবন-যাপন করা সত্ত্বেও দুনিয়ার বড়ো বড়ো বাদশাহরা তাঁর সামনে মাথা নত করতো। কিসরা ও কায়সার-এর বাদশাহ। যাদের নাম শুনলে মানুষ কম্পিত হতো তারা পর্যন্ত ফারুকে আযম রাদি.-এর সামনে মাথা নত করেছিলো। কারণ, তাঁর ইলম, আমল ও ইখলাস একত্রিত হয়ে এ শক্তি অর্জিত হয়েছিলো।

ইমাম গাযালি রহ.-এর প্রতি প্রশ্ন— তোমার পড়ার উদ্দেশ্য কী?

ইমাম গাযালি রহ. খাজা বুআলি রহ.-এর থেকে শৈশবে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষার অবস্থা বোঝার জন্য তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনাই যথেষ্ট। তিনি যে মাদরাসায় লেখাপড়া করতেন, সে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন বাদশাহ 'নিযামুল মুলক তুসি'। একবার বাদশাহ-কে অবহিত করা হলো যে, 'জনাব! আপনি যে মাদরাসা নির্মাণ করেছেন সেখানকার ছাত্ররা তো কিতাব পড়ে দুনিয়াদার হয়ে যাচ্ছে।' তখন তিনি ভাবলেন— ছাত্ররা যদি কিতাব পড়ে দুনিয়াদার হয়ে যায়, তাহলে মাদরাসা রেখে আর কী লাভ। তারচে' বন্ধ করে দেয়াই উত্তম। তবে আমি একবার গিয়ে নিজে দেখে আসবো।

বাদশাহ ছদ্মবেশে মাদরাসা পর্যবেক্ষণের জন্য আসলেন। তিনি এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই! তোমার এখানে লেখাপড়ার করার উদ্দেশ্য কী?' প্রত্যুত্তরে ছাত্র বললো—'আমার পিতা অমুক মাদরাসার মুফতি। তাই আমিও মুফতি হবো। এতে মানুষের মাঝে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।'

দ্বিতীয় আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করার পর সে বললো—'আমার পিতা অমুক স্থানের বিচারক। বড়ো হয়ে আমি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য লেখাপড়া করছি।'

তৃতীয় আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করার পর সে উত্তর দিলো—'বর্তমান বাদশাহ আলেমদের খুব সমীহ করেন। তাই আমি আলেম হবো এবং বাদশাহর একান্ত প্রিয়জন হবো।'

এসকল কথা শুনে বাদশাহ চিন্তা করলেন, আসলেই তো এরা সব দুনিয়াদার। আমার এতো সম্পদ ব্যয় করে কী লাভ। তারচে' মাদরাসা বন্ধ করে দেয়াই ভালো হবে।

এ মনোভাব নিয়ে যখন তিনি বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন দরজার পাশে বাতির আলোতে একছাত্রকে পড়তে দেখলেন। চিন্তা করলেন, তার সাথেও কিছু কথা বলে যাই। বাদশাহ ছাত্রটির কাছে এসে সালাম দিলেন। ছাত্র সালামের উত্তর দিলেন। ব্যস, এরপর সে আবার মনোযোগসহ পড়তে শুরু করলেন। বাদশাহ বললেন, 'কী ব্যাপার! তুমি কী আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না?' তখন ছাত্র বললো—'জনাব! আমি এখানে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আসিনি।' বাদশাহ বললেন—'তাহলে তুমি কীজন্য এসেছো?' ছাত্র বললো—'আমি এসেছি আমার আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতি আমার জানা নেই। কিন্তু সে পদ্ধতি এ কিতাবগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। তাই আমি কিতাব পড়ছি এবং সে অনুযায়ী আমল করবো। এভাবে আমি আমার মাওলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো।'

এ ছাত্র যখন বড়ো হলো তখন সে যামানার ইমাম গাযালিতে পরিণত হয়েছিলো। এটা উস্তাদের সংস্রবের কারণে হয়েছিলো। কারণ, উস্তাদ শৈশবেই তাঁর অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।[২৫]

উত্তম নিয়তে কিতাব পড়া দরকার

হযরত কাসেম নানুতুবি রহ.-কে একলোক জিজ্ঞাসা করলো—'হযরত! আপনি যে সমস্ত কিতাব পড়েছেন সে সমস্ত কিতাব তো আপনার সাথিরাও পড়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সম্মান দান করেছেন তারা তো সে সম্মানের অধিকারী হননি। এর কারণ কী?' নানুতুবি রহ. বললেন—'আমার সাথিরা কুরআনের আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন ও কুরআনের হাকিকত বুঝার নিয়তে পবিত্র কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করেছেন। যা তাঁদের অর্জন হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা ওই নিয়ামত লাভ করতে পারেনি যা আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন।'

লোকটি আবার প্রশ্ন করলো—'আপনি এ নিয়ামত কীভাবে অর্জন করলেন?' তিনি বললেন—'আমি যখন পবিত্র কুরআনুল কারিম

[২৫]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৩/২০১।

তিলাওয়াত করেছি তখন এ নিয়তে তিলাওয়াত করেছি যে, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা হাজির। আমল করার জন্য তোমার হুকুম জানতে চায়।'

সুবহানাল্লাহ! এ গুণটিই সাহাবায়েকেরাম রাদি.-এর মাঝে বিদ্যমান ছিলো। সায়্যিদুনা হযরত আবুবকর রাদি.-এর সুরা বাকারা আত্মস্থ করতে পূর্ণ আড়াই বছর সময় লেগেছে। অথচ তাঁরা আরবদেশের অধিবাসী। আরবি ব্যাকরণ তাঁদের অজানা ছিলো না। তারপরও কেনো আড়াই বছর সময় লেগেছে। বুঝা গেলো তাঁরা এক এক আয়াত পড়তেন এবং তার উপর আমল করতেন। একদিকে সুরা পূর্ণ হতো অপরদিকে সে সুরার সকল আমলও পূর্ণ হয়ে যেতো।

একজন ডক্টরের আফসোস

একজন পি. এইচ. ডি ডিগ্রিধারী ব্যক্তির পিতা ইনতিকাল করলেন। তিনি এক আলেমকে বললেন—'আপনি আমার পিতার জানাযা পড়াবেন।' জানাযা শেষ হওয়ার পর লোকটি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। লোকজন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'এ দুঃখ আমাদের সকলের জীবনেই এসে থাকে। সুতরাং ধৈর্য ধরুন।' কিন্তু তিনি কাঁদতেই থাকলেন। অবশেষে মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি এতো কাঁদছেন কেনো?' লোকটি বললেন—'আমি আমার পিতাকে হারানোর জন্য কাঁদছি না। কারণ, মৃত্যু সকলের জন্যই অনিবার্য। বরং আমি কাঁদছি আমার পিতা আমাকে দুনিয়াবি শিক্ষায় পি. এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করিয়েছেন। কিন্তু ধর্মীয় কোনো শিক্ষা দান করেননি। আজ আমার সামনে আমার পিতার লাশ রয়েছে কিন্তু আমি জানাযা পড়াতে পারলাম না।'[২৬]

ইলমের রাস্তায় ধোঁকাবাজি কীভাবে?

একজন হাদিছ-সংকলক হাদিছ সংগ্রহ করার জন্য অন্য একজন মুহাদ্দিস-এর নিকট গেলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনি তাঁর ছুটে যাওয়া ঘোড়াকে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরতে পারছেন না। অবশেষে তিনি একটি টুকরির মধ্যে কিছু রেখে ঘোড়াকে ডাক দিলেন যাতে ঘোড়া বুঝতে পারে যে, টুকরিতে কোনো খাদ্য আছে। এরপর ঘোড়া খাবার

---

[২৬]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৩/১৭৫।

খেতে টুকরির কাছে এলো। তখন মুহাদ্দিস সাহেব ঘোড়াকে ধরে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে আগত হাদিছ-সংকলক ফিরে যেতে লাগলেন। পথিমধ্যে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হযরত! আপনি এতোদূর থেকে এসেছেন হাদিছ সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু হাদিছ সংগ্রহ না করেই ফিরে যাচ্ছেন। এর কারণ কী?' তখন তিনি বললেন—'যে একটা পশুকে ধোঁকা দিতে পারে সে যে হাদিছ বর্ণনায় ধোঁকা দিবে না তার নিশ্চয়তা কী?'

আল্লাহর উপর ভরসায় খোদায়ি সাহায্য

ইলম ও জ্ঞানার্জনের জন্য আমাদের পূর্বসূরি মনীষীগণ অনেক ত্যাগ-তীতিক্ষা ও কষ্ট স্বীকার করেছেন। তখন কোনো কিছু এতোটা সহজ ছিলো না। উদাহরণস্বরূপ হযরত সুফিয়ান সাওরি রহ. ও তাঁর দু' সাথির ঘটনা বর্ণনা করছি।

হযরত সুফিয়ান সাওরি রহ. ও তাঁর দু'জন সঙ্গী ইলম অর্জনের জন্য একজন মুহাদ্দিস-এর শরণাপন্ন হলেন। সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন—'আমাদের কাছে আহারের জন্য ছাতু ছিলো। আমরা অল্প অল্প করে প্রতিদিন সে ছাতু আহার করতাম। কিন্তু আমাদের সবক শেষ হওয়ার তিনদিন আগে ছাতু শেষ হয়ে গেলো। তখন আমরা তিনজন পরামর্শ করলাম যে, আমাদের থেকে দু'জন দরসে উপস্থিত হবো। আর বাকি একজন পরিশ্রমের মাধ্যমে খাবারের সংগ্রহে যাবে।

এরপর আমরা দু'জন পূর্বপরামর্শ অনুযায়ী দরসে চলে গেলাম। আর যার উপর সেদিন খাবার আঞ্জামের দায়িত্ব ছিলো বাজারে না গিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। তিনি চিন্তা করলেন, মানুষের মজদুরি করে কী লাভ হবে। তারচে' আল্লাহর মজদুরি করি। কাজের অসিলায় খাবারের ব্যবস্থা না করে মাওলার মজদুরির মাধ্যমে কোনো অসিলা ছাড়াই দেখি খাবার পাওয়া যায় কিনা।

সুতরাং তিনি সারাদিন মসজিদে নফল ইবাদত-বন্দেগি ও দোয়া করে কাটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কী ভাই! খাবারের কোনো ব্যবস্থা হয়েছে?' তিনি বললেন—'আমি সারাদিন এমন একজন মালিকের মজদুরি করেছি যিনি পরিপূর্ণ হিসাব রাখেন। সুতরাং যথাসময়ে খাবার চলে আসবে।' তাঁর কথা শুনে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন।

এরপর দ্বিতীয় দিন আরেকজনের পালা এলো। তিনিও আগের জনেরমতো চিন্তা করে মসজিদে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগি করতে লাগলেন। আর দোয়া করতে লাগলেন। সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে, তিনিও আগেরজনের মতো উত্তর দিলেন—'আমি এমন মালিকের কাজ করেছি যিনি পরিপূর্ণ পাওনা পরিশোধ করেন। তিনি পাওনা পরিশোধ করার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন।' কথা শুনে সকলে খুশি হলেন।

তৃতীয় দিন অপরজনের পালা এলো। তিনিও পূর্বের দু'জনের মতোই করলেন।

আল্লাহর কী শান! তৃতীয় দিন সেখানকার বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন যে, একটি ভূতের আকৃতিতে তার উপর হাত উঠিয়ে কেউ তাকে বলছে—'সুফিয়ান সাওরি ও তাঁর দু' সাথির খোঁজ নাও।' এরপর বাদশাহ ঘুম থেকে উঠে কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন—'যাও, সুফিয়ান সাওরি নামের ব্যক্তি ও তাঁর দু' সঙ্গীকে খুঁজে বের কর। থলি ভরতি দিরহাম-দিনার দিয়ে বললেন, তাঁদের পাওয়ামাত্রই এ থলি প্রদান করবে। এবং আমাকে তাঁদের খবর সম্পর্কে অবহিত করবে। আমি তাঁদের জন্য রাজকোষাগার উন্মুক্ত করে দেবো।

এদিকে তাঁদের সবক শেষ হয়ে গেলো, অপরদিকে বাদশাহর কর্মচারীরাও তাঁদেরকে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদে এসে হাজির হলো। জিজ্ঞাসা করলো—'এখানে সুফিয়ান সাওরি নামে কেউ আছেন? বর্তমান বাদশাহ আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন। সে স্বপ্নের আদেশ রক্ষার্থেই আমরা এখানে এসেছি।' তখন সুফিয়ান সাওরি রহ. ও তাঁর সাথিরা পরামর্শ করলেন যে, আমাদের সামনে এখন দু'টি দরজা খোলা আছে। এক. আল্লাহর দরজা। দুই. বাদশাহর দরজা। কিন্তু আমরা যেহেতু ইলম অর্জন করেছি সেহেতু আমরা বাদশাহর দরজায় যেতে পারি না। কেননা, তাতে ইলমের অমর্যাদা করা হবে। ধরনা যদি দিতেই হয় তাহলে আমাদের মালিক আল্লাহর ধরনা দেবো।

আল্লাহু আকবার! তিনদিন অনাহারে থেকেও বাদশাহর দরবারে যাওয়া তাঁরা পছন্দ করলেন না। বরং ওই অবস্থাতেই দেশে ফিরে গেলেন। যাঁদের দৃষ্টি আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত তাঁদের প্রতি নুসরাতে ইলাহ বর্ষিত হয়।

দুনিয়াবিমুখতা

ভাওয়ালপুরে এক নওয়াব সাহেব একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর তিনি স্থানীয় ওলামায়েকেরামের সঙ্গে মাদরাসা পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। ওলামায়েকেরাম বললেন—'আমরা আপনাকে এমন একজন ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারবো যাকে আনতে পারলে মাদরাসা খুব ভালো চলবে।' নওয়াব বললেন—'হীরা-মুক্তা আপনারা সংগ্রহ করুন। মূল্য আমি পরিশোধ করবো।' নওয়াব ছিলো একটু অহংকারী। সে জানতে চাইলো—'তাঁর বেতন কতো দেয়া লাগবে?' ওলামায়েকেরাম বললেন—'চার-পাঁচ রুপি।' সেসময়ে সাধারণত এমনই বেতন ধার্য করা হতো। তিনি বললেন—'আপনারা আমার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য একশ' রুপি বেতনের প্রস্তাব রাখবেন।' তখন পাঁচ রুপির পরিবর্তে একশ' রুপি বেতন পাওয়া ছিলো সকলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাই ওলামায়েকেরামও বেশ খুশি হলেন। ভাবলেন, নানুতুবি রহ. হয়তো এখানে যোগদান করবেন। তাঁরা দারুল উলুম দেওবন্দে গিয়ে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন—'হযরত! আমাদের ওখানে নতুন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনি সেখানে তাশরিফ নিলে ভালো হয়। আপনার বেতন একশ' রুপি ধার্য করা হয়েছে। তখন নানুতুবি রহ. বললেন—'আমি এখানে পাঁচ রুপি বেতন পাই। যার তিন রুপি আমার সংসারে খরচ হয়। বাকি দু' রুপি আমি গরিব-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেই। এখন যদি আমার বেতন একশ' রুপি হয় তাহলে আমার তো তিন রুপিই লাগবে বাকি সাতানব্বই রুপি গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার জন্য সারাদিন গরিবদের খুঁজতে হবে। যার ফলে আমার পড়ানোর মাঝে ঘাটতি দেখা দিবে। তাই আমি ওখানে যাবো না।'

তাঁর একথা শুনে ওলামায়েকেরাম বিস্মিত হলেন। তাঁদের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। এ হলো দুনিয়াবিমুখতা। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

পাগড়ি গ্রহণে হযরত থানবি রহ.-এর অনীহা

হযরত আশরাফ আলি থানবি রহ. দাওরায়ে হাদিছ সমাপ্ত করলেন। তখন মাদরাসার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে পাগড়ি প্রদানের জন্য মাহফিলের আয়োজন করা হলো। থানবি রহ. এ খবর জানতে পেরে কিছু সাথিদের নিয়ে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কাছে গিয়ে বললেন—'হযরত! আমরা জানতে পারলাম, আমাদেরকে নাকি সম্মানের প্রতীক-স্বরূপ পাগড়ি প্রদান করা হবে।' শায়েখ বললেন—'হ্যাঁ। তোমরা ঠিকই শুনেছো।' তখন থানবি রহ. বললেন—'হযরত! আমাদের বিনীত নিবেদন হলো আমাদের পাগড়ি না দেয়া হোক। কারণ, মানুষ যেনো এটা মনে না করে যে, অযোগ্য ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান করা হয়েছে। এতে মাদরাসার বদনামি হবে।'

তখন শায়খুল হিন্দ রহ. বললেন—'প্রিয় বৎসগণ! এখন তোমরা উস্তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছো। তাই নিজেদের কদর বুঝতে পারো না।

সে দারুল উলুমের ছাত্র নয়...

দারুল উলুমের শুরু লগ্নের দায়িত্বশীলদের মধ্যে একজন ছিলেন শাহ রফিউদ্দিন সাহেব। তিনি ছিলেন সুফি। তিনি সবসময় ইবাদত-বন্দেগি আর যিকিরে মশগুল থাকতেন। একদিন তিনি অযু করতে পুকুরে গেলেন। তখন একছাত্র ডাল ভরতি একটি পাত্র নিয়ে এসে বললো—'দেখুন! দারুল উলুমের দায়িত্ব আপনার হাতে থাকাকালে মাদরাসায় এমন ডাল রান্না করা হয় যে, তা দ্বারা অযু করা যাবে।' একথা বলে ছাত্রটি ডালের পাত্রটি হাত থেকে ফেলে দিলো।

তারপর সেই ছাত্রকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এ ঘটনা সম্পর্কে যখন অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ অবগত হলেন, তখন তাঁরা খুবই লজ্জিত হলেন এই ভেবে যে, এতোবড়ো দুঃসাহস কার, যে হযরতের সাথে এমন বেয়াদবি করেছে। তারপর শিক্ষকরা হযরতের সঙ্গে দেখা করে বললো—'হযরত! আমরা আসলেই খুবই লজ্জিত যে, একজন ছাত্র

এমনটি করেছে।' তখন রফিউদ্দিন সাহেব বললেন—'সে ছাত্র নয়।' তারপর শিক্ষকরা ভাবলেন, হযরত যেহেতু বলছেন সে ছাত্র নয় তাহলে মাদরাসার বোডিংএ খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ, বোডিং-এর খাতায় সকল ছাত্রদের নাম আছে। বোডিং এর খাতায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো সেখানে তার নাম আছে। এরপর শিক্ষকরা আবার হযরতের কাছে এসে বললেন—'হযরত! বোডিং-এর খাতায় তো তার নাম আছে।' তখনো হযরত বললেন—'না, সে মাদরাসার ছাত্র হতে পারে না।' এরপর শিক্ষকরা চিন্তা করলেন, তাহলে ক্লাসের হাজিরাখাতা দেখলে হয়তো বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে। তাই তারা ক্লাসের হাজিরা খাতা দেখলেন যে, সেখানেও তার নাম আছে। কিন্তু সে ক্লাস করে না। মাঝে মাঝে তার ঘনিষ্ঠ অন্যকোনো ছাত্র তার হাজিরা দিয়ে দেয়। সে শুধু খানা খাওয়ার সময় খাওয়ার জন্য এখানে আসে। এটা দেখে উস্তাদগণ আরো বেশি অনুতপ্ত হলেন। চিন্তা করলেন, আমরা এখানে সর্বদা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে আছি। তা সত্ত্বেও এমন বেয়াদব ছাত্রকে চিনতে পারলাম না। অথচ হুজুর মাঝে মাঝে মাদরাসায় আসেন। এরপরও তাকে চিনতে পারলেন। তারপর তাঁরা হযরতের কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন এবং বললেন—'হযরত! আমরা এখানে সবসময় থেকেও তাকে চিনতে পারলাম না। আর আপনি সবসময় না থেকেই তাকে চিনতে পারলেন। এর কারণ কী?' তখন শাহ সাহেব বললেন—'যখন আমি এখানের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন স্বপ্নে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি একটি পানির বালতি হাতে দাঁড়িয়ে মাদরাসার সকল ছাত্রকে বালতি থেকে পানি ভরে দিচ্ছিলেন। তখন সেসকল ছাত্রদের মাঝে আমি এ ছাত্রটিকে দেখিনি। তাই আমি তাকে চিনতে পেরেছি যে, সে দারুল উলুমের ছাত্র নয়।'

যে গমের বরকত আজো অব্যাহত...

হযরত খাজা মুহাম্মদ আবদুল মালেক কুরাইশি রহ. নিজেকে বকওয়াল বলতেন। অনেক বড়ো শায়েখ ছিলেন। তিনি এ ঘটনা মসজিদে বসে অযুর

সাথে শুনিয়েছিলেন। আর এ অধম মসজিদে বসে অযুর সাথে শুনেছি। এখন মসজিদে বসে অযুর সাথে আপনাদের শোনাচ্ছি পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে। শব্দে একটু পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু মর্মে একটুও পরিবর্তন হবে না।

তিনি বলেছিলেন, আমি শায়েখের ছাগল চরাতাম আর আল্লাহ আল্লাহ করতাম। ছাগলগুলো নিজেরাও চরত আর আমিও ঘাস কেটে সেগুলো খাওয়াতাম। সন্ধ্যায় যখন ছাগলগুলো নিয়ে আসতাম, তখনো কিছু ঘাস আমি মাথায় করে আনতাম। আমার বন্ধুরা শায়েখের মজলিসে বসতেন আর আমি শায়েখের ছাগল চরাতাম।

একবার হযরত খাজা ফজল আলি কুরাইশির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হলো, তুমি আবদুল মালেককে খেলাফত দিয়ে দাও। তিনি বলেন, যখন খেলাফত দেয়া হলো, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, আমি তো এর উপযুক্ত নই। এক-দু ঘণ্টা শুধু কাঁদতেই ছিলাম। অন্যান্য খলিফাগণ এ বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন একটি দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন তা বহন করার শক্তিও দিবেন। তিনি বলেন, আমি মনে মনে এরাদা করে ফেললাম যে, আমি তো এর উপযুক্ত নই, তবুও হযরত আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। যেহেতু আর কাউকে সেটা দেয়ার মতো যোগ্যতা রাখি না, তাই আমি কাউকে বাইয়াত করবো না। এভাবে হযরতের খেদমতে একবছর অতিবাহিত হয়ে গেলো।

একবার শীত-মৌসুমে তিনি আগুন পোহাচ্ছিলেন। আমার দিকে গোস্বার সাথে তাকালেন। হযরতের এরকম দৃষ্টি দেখে আমার অবস্থা তো কাহিল, যেনো আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হযরত! সব ঠিক ঠাক আছে তো?' তিনি বললেন, 'এইমাত্র কাশফের মাধ্যমে আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তিনি বলছিলেন, আবদুল মালেককে বলো, সে যেনো তাকে দেয়া নিয়ামত মানুষের মধ্যে বণ্টন করে। তা না হলে আমি তার নিয়ামত ছিনিয়ে নেবো। এ আদেশ যেহেতু মাহবুবের পক্ষ থেকে এসেছে, তুমি আর দেরি করো না। রাতের আঁধার শেষ হওয়ার আগে-আগে বিছানাপত্র

নিয়ে বাড়িতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে লোকদেরকে আল্লাহ, আল্লাহ শেখাও।' আমি তো কাঁদতেই ছিলাম, হযরত নিজেই আমার ছামানাপত্র এনে আমার মাথায় তুলে দিয়ে বললেন, 'যাও, বাড়িতে চলে যাও।' আমি বললাম, 'হযরত! আমি এখনো কোনো কাজের নই? এতো বছর জিকির-আজকারে কাটিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ার কোনো কাজই শিখিনি। আমার জন্য আপনি রিযিকের দোয়া করুন।' তিনি বললেন—

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'

আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমার বিয়ের জন্য আগে থেকে আমার এক আত্মীয়ের মেয়ে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। সুতরাং বাড়িতে আসতেই তারা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু প্রায় সময়ই ঘরে খাবারের কোনো ব্যবস্থা থাকতো না। তবে স্ত্রী ছিলেন বেশ ধৈর্যশীল। সে বলতো, 'আপনি গাছের পাতা নিয়ে আসুন, আমরা তা-ই খাবো।' আমি তা-ই নিয়ে আসতাম। আর দু'জনে সেগুলো খেয়ে দিন কাটিয়ে দিতাম।

একদিন আমার এক পিরভাই আমার বাড়িতে আসলেন। তিনি হযরতের খানকায় গিয়েছিলেন। ওখান থেকে ফেরার সময় হযরত তাঁকে দশ কিলো ওজনের একটি গমের থলে দিয়েছিলেন। আর সাথে একটি চিঠি দিয়ে বলেছেন, 'এগুলো আবদুল মালেকের কাছে পৌঁছে দিও।' তিনি দুপুরের সময় আমার বাড়িতে পৌঁছে দরজার কড়া নাড়লেন। আমি দরজা খুলে তার সাথে কুশলাদি বিনিময় করলাম। হাতে গমের থলে দেখে আমি মনে করলাম, উনি হয়তো খানকায় যাবেন। খানকার জন্যই হয়তো গম নিয়ে আসছেন।

এরপর আমি ঘরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, 'মেহমানের জন্য খানাপিনার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কী?' স্ত্রী বললো, 'ঘরে তো খাবার কিছুই নেই।' তবে আমার স্ত্রী ছিলো বুদ্ধিমতী। সে বললো, 'আপনি এক কাজ করুন, উনি খানকা শরিফের লঙ্গরখানার জন্য যে গম নিয়ে আসছেন,

তার অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে কিছু গম নিয়ে আসুন। আমি পিষে রুটি বানিয়ে দিই। এতে শরমের কী আছে? গিয়ে বলে দেখুন।' আমি গিয়ে তার অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে কিছু গম নিয়ে রুটির ব্যবস্থা করলাম। খাবার শেষে মেহমানকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ঘুম থেকে উঠে তিনি আমাকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, 'এটা হযরত দিয়েছেন।' তখন বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হলো। বুঝতে পারলাম, হযরত এ গম অধমের জন্যই পাঠিয়েছেন। চিঠিটি খুলে পড়লাম। তাতে লেখা আছে—'আবদুল মালেক! তুমি আল্লাহ আল্লাহ কর এবং আল্লাহ আল্লাহ করাও। এ গমগুলো শক্ত কোনো বন্ধ পাত্রে রেখে দেবে। আর পাত্রের নিচে ছিদ্র করে সেখান থেকে গম বের করে ব্যবহার করবে। এটা তোমার লঙ্গরখানার জন্য। নিচে লেখা ছিলো—

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'

আমার স্ত্রী গমগুলো একটি শক্ত বন্ধপাত্রে রেখে দিলো। ভালোভাবে ঢাকনা বন্ধ করে দিলো। আর নিচের দিক থেকে একটি ছিদ্র করে নিলো। প্রয়োজনমতো সেখান থেকে গম নিয়ে রুটি বানাতো। আলহামদুলিল্লাহ! এ গম আমরা এখনো চল্লিশ বছর যাবৎ ব্যবহার করছি। এখনো আমার খানকাতে দু'তিন শ' মানুষ সবসময় থাকে। এ গম থেকেই সকলের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। বছরের শেষে হাজারের অধিক মানুষ হয়। তাদের খানাও সেই গম থেকে ব্যবস্থা করা হয়। চল্লিশ বছর ধরে এভাবেই সেই গম আমরা ব্যবহার করে আসছি।[২৭]

ইমাম শাফি রহ.-এর জ্ঞানের পূর্ণতা

ওলামায়েকেরামের মাঝে যেসকল মহা মনীষী অল্প বয়সে জ্ঞানের অমীয় সুধা পান করেছেন, ইমাম শাফি রহ. তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনী-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাত্র তেরো বছর বয়সে যামানার ইমাম শাফি

---

২৭. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৬/১৭৯।

হয়েছিলেন। সেই বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনের দরস দান করতেন এবং পাকা চুলবিশিষ্ট শায়েখরা তাঁর দরসে বসতেন। একবার তিনি দরসদান কালে দু'টি চড়ুই পাখি লড়াই করতে করতে তাঁর সামনে এসে পড়লো। তাঁর বয়স কম হওয়ায় তিনি শিশুসুলভ আচরণ করে ফেললেন। তিনি পাগড়ি খুলে পাখি দু'টির উপর রেখে দিলেন। কিন্তু এ কাজটি দরসে অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধ শায়েখদের পছন্দ হলো না। তাঁরা চিন্তা করলেন যে, এটা কুরআনের দরসের আদবের পরিপন্থী।

তখন তিনি পাগড়ি মাথায় বেঁধে বললেন—

الصَّبِيُّ صَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ نَبِيٌّ۔

'শিশু সে তো শিশুই যদিও সে নবি হয়'

একথা শোনার পর শায়েখগণ বুঝতে পারলেন যে, বয়সের স্বল্পতার দরুন তিনি এমনটি করেছেন।

ইলমের প্রতি আকর্ষণ এবং মুতালাআর[২৮] স্বাদ

দু'জন নবির প্রশ্ন ও আশ্চর্য জবাব

আপনাদের সামনে এখন একটি ইলমিকথা পেশ করছি, যা ওলামা ও তলাবাদের ভালো লাগবে। আল্লাহ তাআলার দু'জন নবি এমন ছিলেন, যাদের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা মৃতব্যক্তিকে জীবিত করার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রশ্নের ধরণ ছিলো ভিন্ন। তাঁদের একজন হলেন হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহ তাআলাকে মৃতব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন—

أَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

'মৃত্যুর পর আল্লাহ কীভাবে তাকে জীবিত করবেন?'

এর জবাবে আল্লাহ তাঁকে তখনই মৃত্যু দিয়ে দিলেন এবং এ অবস্থায় তাঁকে ১০০ বছর রাখলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে পুনরায় জীবিত করলেন এবং বললেন, 'হে নবি! এখন বলো।'

দ্বিতীয় নবি হলেন, হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰ؟

'আপনি কীভাবে মানুষকে জীবিত করেন?'[২৯]

---

২৮. মুতালাআ বলা হয়—একাগ্রতার সাথে কিতাব অধ্যয়ন করাকে।

২৯. আল্লাহ তাআলা যে মৃতকে জীবিত করতে পারেন তা তো আমরাও বিশ্বাস করি। আর তাঁরা দু'জন তো ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁরাও এ ব্যাপারটি খুব ভালোভাবেই জানতেন। তারপরও এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার কারণ ছিলো, শুধু নিজচোখে একটু দেখার ইচ্ছামাত্র। অর্থাৎ অন্তরের প্রশান্তি।—অনুবাদক

তখন আল্লাহ তাআলা অন্য একটি প্রাণীকে মৃত্যু দান করলেন এবং পুনরায় জীবিত করে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দেখিয়ে দিলেন।

একই প্রশ্নের দু'জনের সাথে দু'ধরনের আচরণের কারণ হলো, একটি শব্দের পরিবর্তন। অর্থাৎ أَنّٰى শব্দ দ্বারা প্রশ্নের সাথে সাথে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। আর كَيْفَ শব্দ দ্বারা শুধু প্রশ্ন বোঝানো হয়। হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম أَنّٰى শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করেছিলেন। আর হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম كَيْفَ শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করেছিলেন। যেহেতু হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম كَيْفَ শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করেছিলেন, সেহেতু তাঁর পরিবর্তে অন্যএকটি প্রাণীর মৃত্যুদানের পর তাকে আবার জীবিত করে দেখিয়ে দিলেন। পক্ষান্তরে হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করেছিলেন أَنّٰى শব্দ দ্বারা, তাই অন্যকোনো প্রাণীকে মৃত্যু না দিয়ে সরাসরি তাঁকেই মৃত্যু দান করেন।

উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো, শব্দের পরিবর্তের ফলে দু'জনের সাথে দু'ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং বুঝা গেলো যে, বান্দা আল্লাহর সাথে যেমন আচরণ করবে, আল্লাহও বান্দার সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করবেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যেহেতু প্রশ্ন করেছিলেন, সেহেতু তাঁর প্রশ্নের মূল্যায়নও করেছেন। অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটাও বলে দিয়েছেন যে, 'হে আমার প্রিয় খলিল! আমি মৃতকে জীবিত করে তোমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি, কিন্তু প্রশ্ন যেহেতু করেছো, সেহেতু তার মূল্যও তোমার দিতে হবে। তাই এখন প্রিয় পুত্রকে নিজহাতে কুরবানি করো।[৩০]

ইমাম মুসলিম রহ.[৩১]-এর মুতালাআর নিমগ্নতা

ইমাম মুসলিম রহ. ছিলেন হাদিছের জগতে এক অনান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা— একবার তিনি হাদিছের মুতালাআয় খুব বেশি

[৩০]. খুতুবাতে যুলফিকার, পৃ. ৭/১৪৫।

[৩১]. হযরত ইবনে সিরিন রহ.-এর বর্ণনামতে তিনি ২০৬ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। রজব মাসের ২৫ তারিখ ২৬১ হিজরি সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

নিমগ্ন ছিলেন। তখন তাঁর ক্ষুধাও লেগেছিলো। পাশে খেজুরের একটি টুকরি রাখা ছিলো। কিতাবের পাতা উল্টাচ্ছিলেন আর একটি করে খেজুর মুখে দিচ্ছিলেন। হাদিছ মুতালাআয় তিনি এতো বেশি মগ্ন ছিলেন যে, কি পরিমাণ খেজুর খেয়ে ফেললেন তা নিজেও বুঝতে পারলেন না। এমনকি অতিরিক্ত খাবারের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সে অসুস্থতায় ইনতিকাল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-এর ইলমি মজলিস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর দরবারে দরসে হাদিছের বড়ো মজলিস হতো। একবার দোয়াতের সংখ্যা গণনা করে সেখানে চল্লিশ হাজার দোয়াত পাওয়া গেলো। সেসময় স্পিকার বক্স ছিলো না। তাই হাদিছের দরসে নামাযের মুকাব্বিরের ন্যায় মুকাব্বির নিযুক্ত ছিলো। সে মজলিসে ১২ শ' মুকাব্বির নিযুক্ত ছিলো। যে মজলিসের মুকাব্বিরের সংখ্যা বারোশ' সে মজলিসের পরিধি কতোবড়ো হবে? তাঁরা এতোবড়ো মজলিসে হাদিছের দরস প্রদান করতেন।

ইলম-এর প্রতি আকর্ষণ তো একেই বলে...

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এক জায়গায় দরস দিতেন। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি বস্তি ছিলো। সে বস্তির কিছুলোক তাঁর কাছে এসে আবেদন করলো—'হযরত! আপনি আমাদের এখানে তাশরিফ আনুন। আমাদেরকে আপনার দরসে বসার সুযোগ করে দিন।' তিনি বললেন—'আমার হাতে সময় খুব কম।' তারা বললো—'হযরত! আমরা আপনার জন্য সাওয়ারির ব্যবস্থা করবো। এখানে পায়ে হেঁটে আসতে আপনার যে সময়টুকু ব্যয় হয়, সাওয়ারিতে আরোহণ করে এসে সে সময়টুকু আমাদেরকে দিন।'

তিনি তাদের এ প্রস্তাব কবুল করলেন। যখন তিনি সেখানে দরস প্রদান শুরু করলেন। তখন তাঁর দরসে হযরত ইমাম শাফি রহ.ও উপস্থিত হলেন। তিনি আবেদন করলেন—'হযরত! আমি আপনার নিকট অমুক কিতাবটি পড়তে চাই।' তখন ইমাম মুহাম্মদ রহ. বললেন—'ভাই! আমার হাতে তো সময় খুবই কম। আমাকে এখানেও পড়াতে হবে আবার ওই এলাকাতেও পড়াতে হবে। সুতরাং তোমাকে আলাদা সময় দেয়ার মতো সময় তো আমার হাতে

নেই।' ইমাম শাফি রহ. বললেন—'হযরত! আপনি এখান থেকে দরস শেষ করে যখন সাওয়ারিতে আরোহণ করে ওই এলাকায় যাবেন তখন আপনি সাওয়ারিতে বসে বসে আমাকে দরস প্রদান করবেন। আর আমি দৌঁড়ে দৌঁড়ে আপনার দরস শুনবো।'

চিন্তা করুন! পৃথিবীতে ইলম ও জ্ঞানার্জনের প্রতি আকর্ষণের এরচে' উৎকৃষ্ট কোনো উদাহরণ আর কী হতে পারে? এটা হলো ইসলামের সৌন্দর্য।

ইলমের আকর্ষণে ঘুম উড়ে যায়

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ছিলেন ইমাম শাফি রহ.-এর উস্তাদ। ইমাম শাফি রহ. বলেন—'একবার আমার উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর কাছে রাত্রি যাপনের সুযোগ হয়েছিলো। আমি দেখলাম, তিনি ইশার নামাযের পর বাতি জ্বালিয়ে কিছু সময় কিতাব অধ্যয়নের পর শুয়ে পড়লেন। এরপর কিছু সময় পরে তিনি উঠে বাতি জ্বালিয়ে কিছু সময় পড়লেন এবং বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি সারারাত জেগেছিলাম। আমি দেখলাম তিনি সারারাতে সতেরো বার বিছানা থেকে উঠলেন এবং বাতি জ্বালিয়ে কিছু সময় কিতাব পড়ে আবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।'

ইমাম শাফি রহ. বলেন—'আমি সকালে হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হযরত! আপনি সারারাতে সতেরো বার জাগ্রত হয়েছেন। তাহলে ঘুমিয়েছেন কখন?' আমার প্রিয়শায়েখ তখন বললেন—'আমি তো রাতে ঘুমাইনি। বরং সারারাতে এক হাজার মাসআলার সমাধান বের করেছি।'

আল্লাহু আকবার! এখন চিন্তা করুন তাঁর অবস্থা। আর তিনি যে বারে বারে বাতি নিভিয়ে দিচ্ছিলেন, এর কারণ হলো—যাতে অযথা তেল না ফুরায়। অপচয় থেকে বাঁচা যায়।

জ্ঞানার্জনের মেহনত

আমাদের পূর্বসূরিগণ এ ইলম অর্জনের জন্য এতো পরিশ্রম করেছেন যে, আজ আমরা তাঁদের পরিশ্রম ও কীর্তি শুনে বিস্মিত হই। চিন্তা করা যায়! ইমাম শাফি রহ. মাত্র তেরো বছর বয়সে 'ইমাম' হয়েছিলেন। তেরো বছর বয়সে কুরআন-হাদিছের জ্ঞানার্জন করে মানুষকে হাদিছের দরস প্রদান

করেছিলেন। এ ছিলো তাঁদের ইলম অর্জনের মেহনত। ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই তাঁরা জ্ঞানের সমুদ্রে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্তিম মুহূর্তেও ইলমের প্রতি আকর্ষণ

হযরত আবু ইউসুফ রহ. যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাঁর এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আরোহী অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম নাকি পায়ে হাঁটা অবস্থায়?' ছাত্র বললো—'আরোহী অবস্থায়।' তিনি বললেন—'না।' তখন ছাত্র আবার বললো—'পায়ে হাঁটা অবস্থায়।' তিনি তখনও বললেন—'না।' এরপর জিজ্ঞাসা করলেন—'আরোহী অবস্থায় কখন কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম আর পায়ে হেঁটে কখন উত্তম?' এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করার কারণ কী? ওলামায়েকেরাম এ প্রশ্ন করেছেন আবার এর জবাবও লিখেছেন। মুমূর্ষু অবস্থায় শয়তান মানুষের কাছে আসে। হয়তো তাঁর কাছেও অভিশপ্ত শয়তান এসেছিলো। যখন তিনি শয়তানকে দেখতে পান তখন মাসআলা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এ মাসআলার অসিলায় হয়তো আল্লাহ তাআলা তাঁকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করেছেন।

যে পথের পথিক আমরা

হযরত বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-এর ব্যাপারে হযরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. বলেন—'আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে যেমন অন্যসকল ফেরেশতাদের উপর মর্যাদাবান করেছেন, তদ্রূপ হযরত বায়েজিদ বোস্তামি রহ.-কেও আওলিয়াকেরামের উপর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন।'

হযরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. আরো বলেন—'বুস্তামি রহ. যখন শৈশবে পিতাকে হারান, তখন তার মা তাঁকে মাদরাসায় ভর্তি করেন এবং শিক্ষককে বলেন, 'আমার সন্তানকে আপনার নিকটেই রাখবেন। বাড়িতে বেশি যেতে দেবেন না। কারণ, এর দ্বারা তার ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বোস্তামি রহ. এভাবে মাদরাসায় থাকতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ মায়ের কথা খুব মনে হলো। মা'কে দেখতে ইচ্ছা হলো। তিনি শিক্ষকের নিকট বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। শিক্ষক বললেন—'যদি তুমি এ পরিমাণ সবক শোনাতে পারো, তাহলে ছুটি পাবে।' তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। শিক্ষকের নির্ধারিত পরিমাণ সবক শুনিয়ে দিয়ে ছুটি পেলেন। বাড়িতে গিয়ে দরজায় নক করলেন। তখন তাঁর মা অযু করছিলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন—'কে?।' তিনি বললেন—'আমি বায়েজিদ।' মা বললেন—'আমারও একটি ছেলে আছে। তার নামও বায়েজিদ। আমি তাকে আল্লাহর রাস্তায় অর্পণ করেছি। তাহলে তুমি কোন বায়েজিদ?' বালক বায়েজিদ রহ.-এর বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, আমি দরজায় কোনো শব্দ করি, এটা মা চান না। বরং মা চান আমি মাদরাসায় ফিরে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। তিনি সোজা মাদরাসায় ফিরে গেলেন। এরপর তিনি 'বায়েজিদ বোস্তামি' হওয়ার আগ পর্যন্ত মাদরাসা থেকে আর কোথাও যাননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে যামানার বায়েজিদ বানিয়েছিলেন।

ইলমের তৃষ্ণায় জেলখানায় অবস্থান

হযরত ইমাম তাইমিয়া রহ-এর জীবনীতে পাওয়া যায়। একবার তৎকালীন সময়ের বাদশাহ তাঁর নিকট কোনো বিষয়ের ফতওয়া চাইলেন। কিন্তু তিনি ফতওয়া দেন নি। ফলে বাদশাহ তাঁকে জেলখানায় বন্দী করেন।

এরপর জেলখানায় কেটে গেলো টানা তিনটি দিন। একদিন বাদশাহ সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় রাজদরবারে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করলো এক তালেবে ইলম। সে ছিলো সুন্দর, সুদর্শন যুবক। তার চেহারায় ছিলো মায়াবি ছাপ। তাকে দেখামাত্র রাজদরবারে উপস্থিত সকলেরই মায়ার উদ্রেক হলো। এমনকি রাজার মনেও তার প্রতি মায়া জন্মালো। রাজা তাকে অভয় দিয়ে বললেন—'হে যুবক! তুমি কাঁদছো কেনো? তুমি এভাবে কেদো না। এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি কী চাও বল, আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবো।'

বাদশাহর অভয়বাণী শুনে যুবক বললো—'বাদশাহ সালামত! আপনি আমাকে জেলখানায় বন্দী করুন।' তার কথা শুনে বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'জেলখানায় যাওয়ার জন্য তুমি এমন উৎসুক কেনো?' যুবক বললো—'আজ তিনদিন হলো আপনি আমার উস্তাদকে জেলখানায় বন্দী করে রেখেছেন। যার ফলে আমি আমার উস্তাদের নিকট থেকে সবক পড়তে পারছি না। আপনি যদি আমাকে জেলখানায় বন্দী করেন, তাহলে আমি সেখানে আমার উস্তাদের নিকট থেকে সবক পড়তে পারবো। কারাবরণ করার কষ্ট আমার কাছে কোনো কষ্টই মনে হবে না।'

এ তালিবুল ইলম ছিলো হযরত তাইমিয়া রহ.-এর ছাত্র। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। এমন চরিত্র আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। আমাদের সম্পর্ক বর্তমানে টিভি ও ছবির সঙ্গে। কুরআনের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআন খুলে দেখার সময়ও আমাদের নেই। কিছু পরিবার তো এমন রয়েছে, যাদের কুরআন শরিফ খুলে দেখার সময়ই হয় না।

ইলমের পিপাসা এমনও হয়?

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. যখন শেষ বয়সে উপনীত হলেন, তখন একদিন তাঁর ছেলে হযরত শাহ আবদুল আজিজ রহ. ক্লাসে পাঠ দান করা অবস্থায় পানি চাইলেন। একছাত্র দৌড়ে তাঁর ঘরে গিয়ে বললো, শাহ সাহেব পানি চেয়েছেন। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. বললেন, আফসোস! আমার বংশ থেকে ইলম উঠে গেছে। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি একথা বলার ব্যাপারে এতো ত্বরা করবেন না। আগে বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করে দেখি। এরপর তিনি পানির গ্লাসে কিছু সিরকা মিশিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সিরকা সাধারণত তিক্ত ও ভিন্ন স্বাদের হয়ে থাকে। যা পানির স্বাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পানির গ্লাস শাহ আবদুল আজিজ রহ.-এর হাতে দেয়ার পর তিনি তা পান করলেন। তারপর ক্লাস শেষ হওয়ার পর যখন ঘরে এলেন, তখন তাঁর মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেটা! তুমি যে পানি পান করেছো, তার স্বাদ কেমন ছিলো? তিনি বললেন, 'মা! তা তো বলতে পারবো না।' তখন মা, বাবার কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখলেন তো! আবদুল আজিজ ইলমের প্রতি গাফলতির কারণে পানি পান করেনি বরং সে তীব্র পানির পিপাসার কারণেই পানি পান করেছে। যা তার আসলেই প্রয়োজন

ছিলো। অন্যথায় হয়তো সে ক্লাস করাতে পারতো না। সুতরাং আমাদের বংশ থেকে এখনো ইলমের আদব উঠে যায়নি।' তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং দোয়া করলেন—'হে আল্লাহ! তুমি আমার বংশে সর্বদা ইলম ও ইলমের আদব জারি রেখো।'

ফতওয়া পড়তে পড়তে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন

দারুল উলুম দেওবন্দের এক মুফতি সাহেবের জীবনালেখ্য পাওয়া যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বুকের উপর একটি ফতওয়ার কাগজ পাওয়া গিয়েছিলো। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ফতওয়া পড়তে ছিলেন। ফতওয়া পড়া অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর ফতওয়ার কাগজটি তাঁর হাত থেকে বুকের উপর পড়ে যায়।

আমাদের আকাবিরে দীন এভাবেই সময়কে গনিমত মনে করতেন। ইবাদতের মাধ্যমে সময়কে ব্যয় করতেন।

এমনও জ্ঞানপিপাসু ছিলো তখন

হযরত শাহ আবদুল কাদের রায়পুরি রহ.[৩২] বলেন, আমি ভর্তির জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে গেলাম। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর নাযেমে তালিমাত সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, ভর্তি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি হযরতকে খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হযরত! আমি কী জানতে পারি ভর্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কী?' নাযেম সাহেব আমাকে বললেন, 'আসলে আমাদের এখানে ছাত্রদের কোনো বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা নেই। গ্রামবাসী যে ক'জন ছাত্রের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে, সে ক'জন ছাত্রকেই ভর্তি করি। অন্যদের ফিরিয়ে দিই।' তখন আমি বললাম, 'হযরত! আমার খাবারের দায়িত্ব যদি আমার নিজের উপর থাকে, তাহলে কী আমি ভর্তি হতে পারবো?' তিনি বললেন, 'তাহলে ঠিক আছে।'

---

৩২. তাঁর জন্মের ব্যাপারে সঠিক কোনো তারিখ পাওয়া যায় না। তবে ধারণা মুতাবিক হযরত আলি মিয়া নদবি রহ. লিখেছেন, ১২৯০ হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা তাঁর নাম রাখেন গোলাম জিলানি। কিন্তু তাঁর মুরশিদ তার নাম রাখেন আবদুল কাদের। লাহোরে তিনি ইনতিকাল করেন। জুমার দিন সুবহেসাদিকের সময় তাকে সমাহিত করা হয়। —سوانح رائے پوری

অবশেষে আমি ভর্তি হলাম। আর আমি সারাদিন ক্লাস করতাম, রাতে তাকরার করতাম। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো, তখন আমি পাশের বস্তিতে অবস্থিত বাজারে যেতাম। বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে আমের খোসা, তরমুজের খোসা পাওয়া যেতো। আমি সেগুলো কুড়িয়ে এনে ভালোকরে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলতাম। এরপর সারাদিন ক্লাস করতাম। এটাই ছিলো আমার সারাদিনের খাবার। এভাবে আমি সারাবছর অতিবাহিত করলাম। কিন্তু কোনোদিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতাম না।

চিঠির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতাম না

শাহ আবদুল কাদের রায়পুরি রহ.-এর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—ছাত্র জীবনে যখন বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসতো, তখন তা খুলতাম না। কারণ, ভাবতাম যদি চিঠিতে কোনো খুশির খবর থাকে তাহলে বাড়ি যেতে মন চাইবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো দুঃখের খবর থাকে তাহলে পড়ালেখায় মন বসবে না। ফলে আমি ইলম থেকে বঞ্চিত হবো।

এভাবে সারাবছরের চিঠিগুলো জমা করে রাখতাম। অবশেষে শাবান মাসে বার্ষিক পরীক্ষার পর যখন অবসর হতাম, তখন সব চিঠিগুলো খুলে পড়তাম এবং এর একটা ফিরিস্তি তৈরি করতাম। যখন বাড়িতে যেতাম তখন খুশির সংবাদদাতাকে অভিনন্দন জানাতাম আর দুঃখের সংবাদদাতাকে সান্ত্বনা দিতাম। ফলে সবাই আমার উপর খুশি হয়ে যেতেন। কিন্তু তাদের তো আর এটা জানা ছিলো না যে, আমি তাদের চিঠি সবেমাত্র পড়েছি।

পৃথিবীতে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এমনই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রদের তো পড়াশোনার চেয়ে বাইরের কথাবার্তা শোনার প্রতি আগ্রহ বেশি। তাকরার করতে বসলে তাকরারের কথা শোনার চেয়ে বাইরের কথা বেশি শোনে। এমননকি তাকরারে বসে তো দেশের রাজনীতির সব ফয়সালাও হয়ে যায়। এর কারণ হলো—অনর্থক কথাবার্তার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে ইলম থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

যে কলমের বিশ্রাম নেই

এক মুহাদ্দিস সাহেবের জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি তাঁর জীবনে এ পরিমাণ কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যদি তাঁর গোটা জীবনের দিনগুলো হিসাব করা হয়, আর তাঁর রচিত কিতাবগুলোর পৃষ্ঠা গণনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, প্রতিদিন গড়ে দশপৃষ্ঠা করে লেখা হয়েছে। অথচ এটা কোনো মামুলি বিষয় ছিলো না।

জন্মের পর থেকেই তো আর মানুষ লেখতে পারে না। বরং বারো/তেরো বছর জ্ঞানার্জনের পর থেকে হয়তো লেখেন। সুতরাং জ্ঞানার্জনের এ বছরগুলো যদি বাদ দেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে দশের পরিবর্তে প্রতিদিন বিশপৃষ্ঠা হয়ে যাবে। আমাদের দ্বারা বিশপৃষ্ঠা লেখা তো দূরের কথা বিশপৃষ্ঠা ভালোভাবে বুঝে পড়াই তো অসম্ভব। যারা লেখক, তারা হয়তো জানেন যে, দিনে একপৃষ্ঠা লেখা কতো কঠিন। সুতরাং চিন্তা করুন, তাঁরা কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন।

সফরের প্রবল আগ্রহ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম[৩৩] সতেরো বছরের যুবক। এখনকার সময়ের সতেরো বছরের কোনো যুবককে যদি ঘরের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সে হয়তো তা ঠিকমতো পালন করতে পারবে না, অথচ সতেরো বছরের যুবক মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, রাজা দাহিরের মতো প্রতাপশালী শাসকের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আমি সিন্ধু এলাকায় সেই স্থান দেখেছি যেখানে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও রাজা দাহির যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। যুদ্ধের ময়দান এতোটাই বিস্তৃত যে, ময়দান দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি চিন্তা করলাম, এ নওজোয়ান কীভাবে এখানে এসেছিলেন? তাঁর সাথে তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তেমন কোনো সৈন্যদলও ছিলো না।

---

৩৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ছিলেন সিন্ধু-বিজেতা। ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক-এর ইনতিকালের পর তিনি জুলুমের শিকার হন। এবং সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক-এর যামানায় তাঁকে শহিদ করে দেয়া হয়।—তারিখে মিল্লাত, ১/৬৩৮।

যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বললেন, এখন আমাদের সকল সৈন্যরা বিভিন্ন অভিযানে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, আমাদের কিছু সংখ্যক মহিলা সমুদ্রপথে আসছিলো। পথিমধ্যে রাজা দাহিরের জলদস্যুবাহিনী তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে। তারা চিৎকার করে বলছিলো—

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম 'আমাদের বাচাঁও', আমাদের বাচাঁও' এ বাক্যগুলো শুনে "Cornernee lings"-এর নওজোয়ানদের একত্র করলেন। তারা যদিও যুদ্ধে পরিপক্ক ছিলেন না কিন্তু ইমানি বলে বলীয়ান ছিলেন। তাই তারা ইমানের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বললেন—

'হে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম! আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা যাবো।' ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, মুসলিম বোনদের আকুতির এ বাক্যগুলো মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের মাথায় এমনভাবে বিদ্ধ ছিলো যে, তিনি হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে বলতেন—

لبيك يا اختى' لبيك يا اختى

'আমার বোন! আমি উপস্থিত। আমার বোন! আমি উপস্থিত।'

একপর্যায়ে তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে রাজা দাহিরের এলাকায় পৌছেন এবং রাজা দাহিরের সুসজ্জিত সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন করে দেন। তিনি রাজা দাহিরকে পরাস্থ করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং নিজের আস্থাভাজনকে সেখানকার স্থলাভিষিক্ত করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এমনকি তিনি সিন্ধু থেকে মুলতান পর্যন্ত ইসলামের বিজয়ী কেতন উড্ডীন করেন।

আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যদি এমন চেতনা বিরাজ করতো, তাহলে পৃথিবীর কোনো অপশক্তিই আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পেতো না। সুতরাং আমাদের শ্রম ও মেহনতকে কাজে লাগাতে হবে। আরাম-আয়েশের জীবন মূলত সফলতার জীবন নয় বরং সফল জীবন তো হলো চেষ্টা-মুজাহাদা ও কর্মময় জীবন।

দরসের প্রতি আগ্রহের অনন্য দৃষ্টান্ত

হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জলন্ধরি রহ.[৩৪] একবার হাদিছের দরসদানকালে একছাত্র প্রশ্ন করলো। যে প্রশ্নের উত্তর তখন তাঁর মাথায় আসছিলো না। আমাদের যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে আমরা তো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এখানে যে আসলেই সূক্ষ্ম কিছু বিষয় আছে তা ছাত্রদের বুঝতেই দেই না। তখন ছাত্ররা আর কী করবে?

কিন্তু তিনি ছিলেন কঠিন আমানতদার। তিনি মনে করতেন যে, ছাত্ররা যদি উস্তাদকে কোনো প্রশ্ন করে, আর সে প্রশ্নের সমাধান উস্তাদের মাথায় তখন না আসার কারণে তিনি যদি তা এড়িয়ে যান তাহলে এটা খিয়ানতের নামান্তর। তাই তিনি খোলাখুলি বলে দিলেন, এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান এখন আমার মাথায় আসছে না। দীর্ঘসময় পর্যন্ত ছাত্ররা চুপ করে বসে থাকলো। আর তিনি বারবার এটা পড়ছিলেন। কখনো পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছেন, কখনো পড়ছেন। কিন্তু সঠিক কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি বললেন, এ প্রশ্নের সমাধান এখন আমি দিতে পারছি না। আমি অমুক আলেমের কাছে গিয়ে এর সঠিক সমাধান জেনে নেবো। যার কথা তিনি তাঁর ছাত্রদের সামনে বললেন, 'তিনি ছিলেন তারই প্রাক্তনছাত্র। একথা শুনে এক ছাত্র সেই আলেম-এর কাছে দৌড়ে গিয়ে বললো, হুজুর আপনার কাছে এ ব্যাপারে আসছেন। মাওলানা সাহেব তৎক্ষণাৎ কিতাব বন্ধ করে হযরতের কাছে দৌড়ে গেলেন। বললেন, হযরত! আপনি কী আমায় স্মরণ করেছিলেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! মাওলানা, এ সবক আমার বুঝে আসছে না। দেখো তো এর সমাধান কী?' মাওলানা সাহেব পড়ে বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি কথা ঘুরিয়ে বললেন,' হযরত! আপনি যখন আমাদের পড়িয়েছিলেন তখন এভাবে বলেছিলেন।'

দেখুন! তিনি কীভাবে ঘুরিয়ে কথা বললেন। নিজের দিকে নিসবত করে এটা বোঝান নি যে, আমার অনেক ইলম ও জ্ঞান আছে। আপনি আমার উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে বুঝতে এসেছেন।

---

[৩৪]. ১৩১২ হিজরি মুতাবিক ১৮৯৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯০ হিজরি সনের ২০ শাবান মুতাবিক ১৯৭০ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁদের পক্ষে এমন মনোভাব দেখানো ছিলো খুবই সহজ। কারণ, তাঁরা ছিলেন সংস্রবপ্রাপ্ত। তরবিয়াত প্রাপ্ত। এটাকেই বলে তাসাউফ। এটাই হলো নিজেকে বিলীন করে দেয়া।

নেতৃত্বের ভুল জাতির ধ্বংসের কারণ

ওলামায়েকেরামের জন্য সতর্কতার সাথে জীবন-যাপন করা অপরিহার্য। হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, 'একবার ছোট্ট একটি মেয়ে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলো।' কেউ বললো, 'কী সেই উপদেশ?' তিনি বললেন, 'একবার আমি মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছিলাম। তখন ছিলো বৃষ্টির মৌসুম। সতর্কতার সাথে না হাঁটলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিলো। আমার পাশ দিয়ে এক বালিকা যাচ্ছিলো। তখন আমি তাকে বললাম, 'বেটি! সাবধানে যেও, দেখো যেনো পা পিছলে না যায়।' মেয়েটি বললো, 'জনাব! আমি তো সতর্কতা অবলম্বন করবোই। তবে আপনি আরো বেশি সতর্ক থাকবেন। কেননা, আমি পিছলে পড়ে গেলে শুধু আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। পক্ষান্তরে আপনি পড়ে গেলে গোটা উম্মত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

আমাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। আপনারা দৃঢ়তার সাথে শরিয়ত ও সুন্নাতের উপর আমল করবেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে 'কুরআন সৃষ্ট কি না' এ মাসআলার ক্ষেত্রে এমনভাবে বেত্রাঘাত করা হতো যে, সে বেত্রাঘাত যদি কোনো হাতির গায়ে করা হতো, তাহলে হাতিও লাফিয়ে উঠতো। তাঁর শরীরে যে জায়গায় বেত্রাঘাত করা হতো, সে স্থানটুকু অবশ হয়ে যেতো। তারপর সে অংশের গোশত কেটে মলম ও পট্টি বেঁধে দেয়া হতো। দীনের জন্য তিনি কী পরিমাণ দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিলেন।

পড়াশোনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা দরকার

একবার আমি ইসলামিক সেন্টারে মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। সেখানের সকল ছাত্ররা গ্রাজুয়েট ক্লাসের বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলো। আমি তাদের প্রত্যেককে তিনটি করে প্রশ্ন করেছিলাম। এক ছাত্রের সাথে তার আট/নয়

বছরের একটি ভাইও ছিলো। আমি চিন্তা করলাম তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি। তারপর তাকে বললাম—

Ok, please tell me, who made this table?

'বলো তো এ টেবিল কে বানিয়েছে?'

Sir, Allah gave man brain and man used that brain and he made this table.

'স্যার! আল্লাহ মানুষকে মেধা দান করেছেন। আর মানুষ সে মেধার সাহায্যে এ টেবিল বানিয়েছে।'

এ ছোট্ট বালকের বুদ্ধিদীপ্ত জবাব আমাকে বিস্মিত করলো। আমি দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আগ্রহী হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—

You tell me, why you read the Quran? Do you feel it is mandatory or it is interesting?

'তুমি কুরআন পড়ো কেনো? তুমি কী মনে করো কুরআন পড়া কোনো জ্ঞানলব্ধ কাজ বা চিত্তাকর্ষক?

অর্থাৎ আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, তুমি কি কুরআন নিজ ইচ্ছায় পড়ো, নাকি জোরজবরদস্তির কারণে পড়ো।

সে উত্তর দিলো—

Sir! I feel it is both mandatory as well as very interesting.

'স্যার! আমি কুরআন পড়ে দু'টি বিষয় বুঝতে পারি, পবিত্র কুরআন পাঠ করা যেমন জ্ঞানমূলক তেমনি চিত্তাকর্ষক।'

আমি তাকে তৃতীয় প্রশ্ন করলাম—

Ok, you tell me, what you want to be in your life?

'তুমি বড়ো হয়ে কী হতে চাও?

সে বললো—

Sir! I want to be the President of America.

'স্যার! আমি বড়ো হয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চাই।'

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চাও কেনো? সে বললো—

Sir! I will be the frist Muslim President of America.

'স্যার! আমি আমেরিকার প্রথম মুসলমান প্রেসিডেন্ট হতে চাই।'

সুবহানাল্লাহ! মুসলমানদের ছেলেদের মধ্যে যদি এমন জযবা ও সংকল্প থাকে তাহলে সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে বসিয়ে মুসলমানদের ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ানোর তাওফিক দান করবেন।

প্রতিভা ও জ্ঞানের সূক্ষ্মতা

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. মুখস্থশক্তি কোথায় পেলেন?

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. মুসলমান হওয়ার পর তাঁর বৃদ্ধকাল শুরু হয়েছিলো। অধিকাংশ সময় তিনি ভুলে যেতেন। কিছু মনে রাখতে পারতেন না।

একদিন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কিছু মনে থাকে না। আমি আপনার বাণী যা শুনি ভুলে যাই।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার চাদরখানা মেলে ধর।' তিনি যখন চাদর মেলে ধরলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাতের ইশারা করলেন, যেনো তিনি হাত ভরে চাদরে কিছু রাখছেন। এরপর বললেন, আবু হুরায়রা! চাদর বেঁধে নাও।' এরপর থেকে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ধী-শক্তিসম্পন্ন করলেন যে, তিনি আর কিছুই ভুলতেন না।

সুবহানাল্লাহ! তিনি ইলম অর্জনের জন্য অগ্রসর হয়েছেন। আর উস্তাদ দোয়া করে দিয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করলেন। ফলে তিনি এমন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন যে, তাঁর ব্যাপারে মুফতি শফি রহ.[৩৫] বলেন যে, আবু হুরায়রা রাদি. 'মৌলবি' ধরনের সাহাবি ছিলেন। কারণ, তিনি অধিকাংশ সময় হাদিছ সংকলনের চিন্তায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন। এজন্যই তিনি সকল সাহাবির চেয়ে অধিক হাদিছ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

---

[৩৫]. তিনি ১৩১৪ হিজরিতে দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বছর বয়সে পিতার সাথে তিনি হযরত থানবি রহ.-এর খেদমতে হাজির হন। ১৩৪৯ হিজরিতে তিনি খেলাফতপ্রাপ্ত হন। ১৩৯২ হিজরির শাওয়াল মাসে ৮৩ বছর বয়সে করাচিতে ইনতিকাল করেন।—بزم اشرف چراغ.

মুখস্থ তো এমনই হওয়া চাই

একবার খলিফা আবদুল মালেক রহ. চিন্তা করলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদি. তো অধিক হাদিছ বর্ণনাকারী। কিন্তু তিনি কি আসলে হুবহু হাদিছই বর্ণনা করছেন, নাকি রিওয়ায়াত বিল মানা তথা মর্ম ঠিক রেখে অন্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করছেন?

এ সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি একটি মাহফিলের আয়োজন করেন। মাহফিলে হযরত আবু হুরায়রা রাদি.-কে দাওয়াত দেন। এদিকে খলিফা মজলিসের একপাশে পর্দার আড়ালে দু'জন কাতেব নিয়োজিত করলেন। যাদেরকে আদেশ করলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদি. যা বলবেন, আপনারা তা সুন্দরভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ করবেন। মাহফিল শুরু হলে খলিফা হযরত আবদুল মালেক রহ. বললেন, হযরত! আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে অনেক হাদিছ শুনেছেন। সেখান থেকে কিছু হাদিছ শুনিয়ে আমাদেরকেও ধন্য করুন।

খলিফার অনুরোধে হযরত আবু হুরায়রা রাদি. একশ' হাদিছ শুনিয়ে দিলেন। কাতেবদ্বয় একশ' হাদিছই লিপিবদ্ধ করে রাখলেন।

এরপর একবছর পর খলিফা পুনরায় একটি মাহফিলের আয়োজন করলেন। গতবছরের মতো এবারও হযরত আবু হুরায়রা রাদি.-কে দাওয়াত করলেন। আর সেই কাতেবদ্বয়কে বললেন, 'আপনারা গতবছরের নোটটা বের করে রাখবেন। আবু হুরায়রা রাদি. যা বলবেন, তার সাথে এ নোট মেলাবেন।' এরপর খলিফা হযরত আবু হুরায়রা রাদি.-কে বললেন, 'হযরত! আপনি গতবছর যে হাদিছগুলো আমাদের শুনিয়েছিলেন, তা আমাদের বেশ ভালো লেগেছিলো। আমরা উপকৃত হয়েছি। এবারও যদি সেই হাদিছগুলো আপনি আমাদের শুনাতেন তাহলে আমাদের উপকার হতো।' খলিফার হযরত আবু হুরায়রা রাদি. সেই হাদিছগুলো শোনালেন। কাতেবদ্বয় অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এক শ' হাদিছের মধ্যে কোথাও একটি অক্ষরের মধ্যেও পরিবর্তন হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন মুখস্থশক্তি দান করেছিলেন।

হাদিছের হাফেয এমনও ছিলেন...

মুখস্থ-শক্তির নিয়ামত মুহাদ্দেসিনেকেরামের নসিব হয়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু দাউদ রহ. একবার ইস্পাহান গেলেন। সেখানকার ওলামায়েকেরাম জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসের ছেলে হিসেবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি আগমন করার পর সবাই অনুরোধ করলেন, আমাদেরকে কিছু হাদিছ শোনান। হাদিছ শোনার আগ্রহে সকলেই একত্রিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ রহ. সে মজলিসে ৩৫ হাজার হাদিছ শুনিয়ে দিলেন।

ফকিহগণের তীক্ষ্ণ মেধা

সুলাইমান ইবনে মেহরান[৩৬] ছিলেন বুখারির রিজালদের একজন। তিনি একবার হযরত আবু ইউসুফ রহ.-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মাসআলাটির সমাধান বলে দিলেন। তখন তিনি আবু ইউসুফ রহ.-কে বললেন, 'আপনি এটা কোত্থেকে শুনেছেন।' তিনি বললেন, 'হযরত! আমি এ হাদিছ আপনার থেকেই শুনেছি।'

তখন সুলাইমান ইবনে মেহরান বললেন, 'তোমার জন্মের পূর্ব থেকেই এ হাদিছ আমার মুখস্থ। কিন্তু তুমি বলার দ্বারা এর সারমর্ম আমি ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছি। আসলে আমরা তো হলাম ফার্মেসীর ন্যায় আর তোমরা হলে ডাক্তারের ন্যায়।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা হাদিছগুলো সঞ্চিত করে রাখি। আর কোন হাদিছ থেকে কী মাসআলা বের হবে এটা তো তোমরাই ভালো জানো।'

সমাপ্ত

---

৩৬. তিনি ৬১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইলমে হাদিসে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা থাকার কারণে তাঁকে শায়খুল ইসলাম বলা হতো। তিনি ১৪৮ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।—سیر التابعین : ۲۰۱

ইলম হযরত সালেম রহ.-কে কোথায় পৌঁছে দিলো

হযরত সালেম রহ. ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। প্রথমে তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তিনশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি হয়েছিলেন। এরপর ইলম অর্জন করে এমন মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন যে, বাদশাহ পর্যন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে অনুমতি নিয়ে আসতেন।

একবার তাঁর সাথে দেখা করতে বাদশাহ এলেন। কিন্তু তিনি তখন ইলমিকাজে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় বাদশাহকে ফিরিয়ে দিলেন। বাদশাহ দেখা না করেই চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি দুনিয়াতে তিনশ' দিরহামে বিক্রি হয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর জন্য সওদা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর দাম বৃদ্ধি করে দিলেন।

যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে এমন মর্যাদা লাভ করেছে সে সৌভাগ্যবান। আর যে এমন মর্যাদা লাভ করেনি তবে এখনো ইলম তলব করছে সেও সৌভাগ্যবান। সুবহানাল্লাহ।